সতের বছর বয়েসে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সতেরো বছর বয়েসে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সজীব প্রকাশন

৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সতেরো বছর বয়েসে
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক ঃ ম. রহমান

প্রথম সজীব প্রকাশন সংস্করণ ঃ জানুয়ারি '৯৯

মুদ্রণ ঃ দে'জ অফসেট, ঢাকা।

প্রচ্ছদ ঃ শ্রী সুবীন দাস

মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা

আমার একটা নদী ছিল। আমার একটা পাহাড় ছিল। আমার একটা নিজস্ব আকাশ ছিল। তখন আমার বয়েস সতেরো।

মেয়েদের ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরার মতন আমারও তখন হাফ প্যান্ট ছেড়ে ফুলপ্যান্ট পরার বয়েস। আমার প্রথম ফুল প্যান্টটি ছিল ঘি রঙের ওপর খয়েরি ডোরা কাটা, হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় সসম্মানে থার্ড ডিভিসানে পাস করার জন্য আমার মা তাঁর লক্ষ্মী পূজার কৌটোর জমানো পয়সা দিয়ে সেটি কিনে দিয়েছিলেন। এছাড়া দুর্গাপূজার সময় মামাবাড়ি থেকে পেয়েছিলাম একটা নীল রঙের বুশ শার্ট, এক জোড়া ছাই রঙের কেডস আমার আগে থেকেই ছিল। এইসব পরে সেজেগুজে আমাকে রীতিমত একটি শৌখিন যুবকের মতন দেখাতো। সিঁথি কাটার বদলে সেই প্রথম চুল ওল্টাতে শুরু করেছি। অবশ্য, অনেকেই তখন আমায় যুবক বলে স্বীকার করতো না, ছেলেটা, ছেলেটা বলেই উল্লেখ করতো।

আমাকে সেবার গেঞ্জি কিনে দেবার কথা মনে পড়েনি আমার মা, বাবার। একদিন দারুণ বৃষ্টি ভিজে দৌড়োতে দৌড়োতে ঢুকে পড়েছি ভাস্করদের বাড়িতে। বৈঠকখানার দরজা খুলে ভাস্কর বললো, জামাটা খুলে ফ্যাল। পাখার তলায় একটু কাঁপতে কাঁপতে বলছিলাম, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ভাস্কর জোর করেই শেষ পর্যন্ত জামাটা গলালো। তারপর বড়দা বড়দা ভাব করে এক ধমক দিয়ে বললো, দ্যাখ সব কিছুরই সীমা আছে। তুই কি রাত্তিরের দিকে কয়লা গুদোমে কাজ করিস নাকি? খোল, শিগগির ওটাও খোল।

আমার গেঞ্জিটা ছিল সত্যিই খুব ময়লা আর পেঁজা পেঁজা, একটু টানাটানি করলেই পুরপুর করে ছিঁড়ে যায়। প্রত্যেকবার কাচার সময় একটু বেশী করে ছেঁড়ে বলে আমি আর ওটা কাচাকাচির ঝামেলায় যেতাম না। সেটা খুলতেই ভাস্কর এক সট মেরে সেটাকে ফেলে দিল রাস্তার হাঁটু জলে। আমার কষ্ট হয়েছিল গেঞ্জিটার জন্য, প্রিয় বিচ্ছেদের মতন।

ভাস্কর ওর নিজের একটা গেঞ্জি এনে পরতে দিয়েছিল। ধপধপে ফর্সা, ধোপাবাড়িতে কাচা ও ইস্তিরি-করা। গেঞ্জিও যে আবার ইস্তিরি করা যায়, সেই ব্যাপারটাই আমি জানতাম না তখন।

ওঃ, সেই কৈশোর যৌবনে কী দারুণ বড়লোক ছিলাম আমি! অফুরন্ত ধন সম্পদ, কী করে খরচ করবো, তার ঠিক ছিল না। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছে, তখন মনে হয়, এই সব বৃষ্টি আমার, যার খুশী স্নান করে নাও। শুকনো জমিতে আর কোনো মলিন কৃষকের তো চোখের জল ফেলবার দরকার নেই, এই তো আমি বৃষ্টিজলে সব ভিজিয়ে দিচ্ছি। মধুপুরের লাল রঙের রাস্তাটা যেখানে ঢালু হয়ে নেমে গেছে নদীর দিকে, সেখানে একটা খুব বড় কদমফুলের গাছ। কদমগাছের ডাল নরম হয়, তবু আমি তরতর করে বেয়ে উঠে যেতে পারি। এত ফুল, ইচ্ছে করলে এ সবই তো আমার। গাছটার প্রায় ডগার কাছে উঠে দাঁড়িয়ে এমন একটা অদ্ভুত ভালো লাগার অনুভূতি হয়েছিল যে ভেবেছিলাম, এখন আমি অনায়াসেই এখান থেকে লাফিয়ে পড়ে মরে যেতে পারি। এমন সুখী মৃত্যু কোনো মানুষের হয় না। আবার এক একদিন রাত্তির বেলা ছাদে গিয়ে একা দাঁড়িয়ে হঠাৎ মনে হতো, বুকের মধ্যে এতখানি ভালোবাসা আছে যে দশখানা পৃথিবী ভর্তি মানুষকে সেই ভালোবাসা দিলেও ফুরোবে না।

মধুপুরে গিয়েছিলাম ভাস্করদের সঙ্গে। আমার জীবনের প্রথম ফুলপ্যান্ট ও বুশ শার্ট পরে সেই প্রথম ভ্রমণ অভিযান। সদ্য স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢোকার ফলে তখন আমাদের একা একা বাইরে বেড়াতে যাবার অধিকার জন্মেছে।

প্রথমে ঠিক ছিল, ওরা তিনজন যাবে, ভাস্কর, আশু আর উৎপল। ভাস্করের এক আত্মীয়ের একটা বাড়ি মধুপুরে এমনিই একলা একলা খালি পড়ে থাকে। সুতরাং থাকার জায়গা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত, এবং ওটুকু হলেই বাবা মা'দের সহজে রাজি করানো যায়। কিন্তু তিনজনে বাইরে বেড়াতে যাবার নানান অসুবিধে। সাইকেল রিকশা ভাড়া নিতে হয় দুটো,

এর মধ্যে কে একটাতে একা চড়বে, তা নিয়ে গণ্ডগোল হয়। ক্যারাম কিংবা তাস তিনজনে খেলা যায় না। তাছাড়াও তিনজন একসঙ্গে থাকলে হঠাৎ হঠাৎ ঝগড়া বেধে যায়। এটা আমরা একবার ডায়মণ্ডহারবার বেড়াতে গিয়েই বুঝেছি। সেইজন্যই ভাস্কর আমায় বললো, নীলু, তুই শুধু ট্রেন ভাড়াটার ব্যবস্থা কর, তাহলেই তোকে আমরা নিয়ে যেতে পারি।

মধুপুরের ট্রেন ভাড়া তখন যাওয়া আসা চোদ্দ টাকা আমি তার চেয়ে অনেক বেশী, তেইশ টাকা যোগাড় করে ফেললাম। বলেছি না, অভাব কাকে বলে তাইই জানতাম না সেই সময়। মার কাছ থেকে তিন টাকা, কাকার কাছ থেকে তিন টাকা, বড় মামার কাছ থেকে পাঁচ টাকা, আমার তিন কলেজে পড়া মাসী—প্রত্যেকের কাছ থেকে দু'টাকা করে এর মধ্যে সবচেয়ে ছোট ঝুনু মাসীই আপত্তি তুলেছিল খানিকটা, তবু শেষ পর্যন্ত দিয়ে দেয়, এছাড়া স্কুলের জ্যামিতি বাক্সটা বিক্রি করে এক টাকা, আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাওয়া মেডেলটা বেচে আড়াই টাকা, পর পর দু'সপ্তাহের রেশন তোলবার সময় একটু বেশী ঝুঁকি নিয়ে মোট এক টাকা বারো আনা করে সরিয়ে ফেলা, এইরকমভাবে আরও উঠতে পারতো, কিন্তু যথেষ্ট হয়েছে ভেবে থেমে গেলাম। দাদার কাছ থেকে টাকা চাইনি, চাইলেও পেতাম না, তবে দাদাকে ধরেছিলাম বাবার কাছ থেকে অনুমতিটা আদায় করে দেবার জন্য। অম্লানমুখে মিথ্যে কথা বলার দাদার জুড়ি নেই।

রাত্তিরবেলা বাবার সঙ্গে দাদার কথা হয়, আমি ঘুমের ভান করে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকি।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কার সঙ্গে যাবে?

দাদা বললো, ভাস্করদের হোল ফ্যামিলি যাচ্ছেন। ভাস্করের বাবা আমাকে বললেন, ওদের তো ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষা হয়ে গেছে, এমনিতেই এখন পড়াশুনা করবে না, সেই জন্যই নিয়ে যাচ্ছি বাইরে।

বাবা বললেন, আমার এখন হাত খালি, টাকা পয়সা দেওয়া আমার পক্ষে এখন সম্ভব নয়।

দাদা বললো, মেসোমশাই তো টাকা পয়সা কিছুতেই দিতে দেবেন না। উনি বললেন, নীলু আমার ছেলের মতন, ওর জন্য আবার টাকা পয়সা কী লাগবে? তাও আমি জোর করে ট্রেনের রিটার্ন টিকিট কেটে দিতে চেয়েছি আমার টিউশানির টাকা থেকে, তাছাড়াও আরও দশটা টাকা দিতে পারি হাত খরচ হিসেবে।

বাবা বললেন, কিন্তু নীলু সাঁতার জানে না, ওকে কি একা একা বাইরে পাঠানো উচিত?

দাদা বললেন, কিন্তু নীলু সাঁতার জানে না, ওকে কি একা একা বাইরে পাঠানো উচিত?

দাদা বললো, মধুপুরে তো পুকুর-টুকুর বিশেষ নেই। শুকনো জায়গা। যদি পুরী যেত, তাহলে না হয় ভয় ছিল। নীলুর প্রায়ই জ্বর হয়, মধুপুরের জল হাওয়া ভালো। আমার মনে হয় কিছুদিন থেকে এলে ওর ভালোই হবে। এমনিতে তো সহজে সুযোগ পাওয়া যায় না।

বাবা তখন জিজ্ঞেস করলেন মায়ের মতামত। মা বললেন, সে তোমরা যা ভালো বুঝবে। বাবা একবার আমার নকল ঘুমন্ত মুখের দিকে চাইলেন।

শেষ পর্যন্ত দাদাকে বাবা বললেন, ওকে তিন চারখানা পোস্ট কার্ড কিনে দিস। গিয়ে যেন নিয়মিত চিঠি লেখে।

সে কথা শুনে আমি বড় বড় নিশ্বাস ফেলতে লাগলুম।

পরদিন সকালে দাদা আমায় জিজ্ঞেস করলো, আমি যে তোর পারমিশান আদায় করে দিলুম, তার বদলে তুই আমায় কি দিবি?

আমি দাদাকে বলতে পারতাম, তুমি কি চাও, বলো? তুমি তৈমুরলঙের পুরো সাম্রাজ্যটা চাও, আমি তোমায় লিখে দিতে পারি। তুমি ট্রেজার আয়ল্যাণ্ডের গুপ্তধন নেবে? কিংবা আকাশের একটা জলভরা মেঘ?

তার বদলে দাদা অতি সামান্য জিনিস চাইলো। সে বললো, ফিরে এসে টানা তিন মাস তুই আমার গেঞ্জি-আণ্ডারওয়্যার কেচে দিবি!

আমি একবাক্যে মেনে নিলাম। আমাদের বাড়িতে প্রত্যেকের জামা কাপড় কাচা নিজের নিজের। আমার মায়ের তখন স্বাস্থ্য খারাপ ছিল।

ট্রেনে আমরা চারজন সদ্য যুবক সম্পূর্ণ স্বাধীন। আমাদের শাসন করবার কেউ নেই। যে-কোনো স্টেশনে ট্রেন থামলে আমরা ইচ্ছে করলেই প্ল্যাটফর্মে নেমে একটু ঘোরাঘুরি করতে পারি। কালি ছোলা আর আদা কিংবা ঝালমুড়ি কিংবা গুলাবি রেউড়ি যত খুশী কিনে খেতে পারি। ভাস্কর এক একটা স্টেশনে নামে আর সিটি দিয়ে ট্রেন ছাড়বার পর দৌড়ে লাফিয়ে কায়দা করে ওঠে।

সহযাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন উপযাচক হয়ে আমাদের অভিবাবক সাজতে চায়। তারা উপদেশ দেয়, ও ভাই, খোলা দরজার পাশে দাঁড়িয়ো না, ও খোকা জানলা দিয়ে অতখানি মাথা ঝুঁকিও না! আমরা এসবে অবশ্য কর্ণপাতও করি না। যতই অন্যরা আমাদের খোকা, ছেলেটা বা ভাই বলে সম্বোধন করুক, আমরা নিজেদের যুবক বলেই দাবি করতে পারি অনায়াসে। চাণক্য শ্লোকে পড়েছি, প্রাপ্তেতু ষোড়শ বর্ষে পুত্রমিত্র বদাচরেৎ। বদাচরেৎ মানে বদ ব্যবহার নয়। মিত্রবৎ অর্থাৎ ষোলো বছর বয়েস হয়ে গেলে ছেলের সঙ্গে বন্ধুর মতন ব্যবহার করবে। থার্ড ডিভিশন পেলে কী হয়, আমি সংস্কৃত বেশ ভালো জানি। ট্রেনের লোকগুলো নিশ্চয়ই চাণক্য শ্লোক পড়েনি।

শক্তিগড় স্টেশনে আমি নেমে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিলাম। এবার আমার পালা। দৌড়ে চলন্ত ট্রেনে ওঠার প্রতিযোগিতায় আমিই বা ওদের কাছে হেরে যাবো কেন? তেমন কোনো তেষ্টা না পেলেও আমরা চার ভাঁড় চা খেয়ে নিলাম। তারপর বাঁড়গুলো একটা ল্যাম্প পোস্টের দিকে টিপ করে করে ছোঁড়া হলো, আশু চাড়া লাগাতে পারলো না কেউই।

আমি ট্রেনের গায়ে এক হাতের হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি বাইরে। ট্রেন ছাড়তে একটু দেরি হলেই বড় উতলা লাগে। কতক্ষণে মধুপুরে পৌঁছাবো? হঠাৎ হঠাৎ মনে হচ্ছে, মাঝরাস্তায় যেন কোনোক্রমে আমাদের যাওয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। যদি কেউ বলে ওঠে, এ ট্রেন আর এগোবে না, আবার ফিরে যাবে হাওড়ায়? কোনোক্রমে একবার মধুপুর পর্যন্ত যেতে পারলে হয়।

পচাৎ করে একজন পানের পিক ফেললো জানলা দিয়ে, একেবারে আমার প্যান্টের ওপরে। ঠিক যেন খুন খারাবি রং। আমি শিউরে উঠলাম। আমার একমাত্র ফুল প্যান্ট! এখন আমি কি করবো? আমার সঙ্গে আর দুটো পা জামা, একটা হাফ প্যান্ট আর দুটো শার্ট আছে। বাইরে বেরুবার সময় সবসময় এই ফুল ফ্যান্টটা দিয়েই চালাবো ভেবেছিলাম। আমি জানলায় সেই লোকটির কাৎলা মাছের মতন মুখখানার দিকে তাকিয়ে রইলাম স্তম্ভিত হয়ে।

আমি দৌড়ে গিয়ে টিউবওয়েলটায় সবেমাত্র হাত দিয়েছি, অমনি বেজে উঠলো ট্রেনের সিটি। তিনবন্ধু সমস্বরে চ্যাঁচাতে লাগলো আমার নাম ধরে। আমি দু'এক মুহূর্তের জন্য ভ্যাবাচাকা খেয়ে আবার ছুটলাম পেছন ফিরে। জীবনে অত জোরে আগে ছুটিনি। আমিও ছুটছি, ওরাও চ্যাঁচাচ্ছে। ওরা বলতে চাইছে, যে-কোনো কামরায় উঠে পড়তে। কিন্তু সে কথা আমার মাথায় ঢুকছে না। বন্ধুদের মধ্যে চলন্ত ট্রেনে ওঠার প্রতিযোগিতায় আমি অনিচ্ছা-কৃতভাবে ফার্স্ট হয়ে লাফিয়ে পড়লাম নিজেদের কামরার মধ্যে। ততক্ষণে আমার কান্না পেয়ে গেছে।

আশু, উৎপল, ভাস্কর সেই পিক-ফেলা লোকটাকে বকুনি দিতে লাগলো দারুণভাবে। আরও অনেক লোক লাগছিল আমাদের দিকে। কিছু লোক হাসতে লাগলো।

সেই লোকটি বোধহয় একবর্ণও বাংলা বোঝে না। ফ্যালফ্যাল করে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো। যদিও তার গোল কালো এবং বড় আকৃতির কাৎলা মাছের মতন মুখ ঠিকই, তবু এরকম মুখেও সরল অসহায়তা ফুটে ওঠে। যাই হোক, পানের পিক গায়ে ফেলার জন্য তো একটা লোককে মারা যায় না, বড় জোর পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে, যেখানে পান খাওয়া নিষিদ্ধ।

লোকটিকে প্রচুর বকুনি দিয়ে গায়ের ঝাল মিটিয়ে নেবার পর ভাস্কর বললো, নীলু প্যান্টটা খুলে ফ্যাল!

ভাস্করের কথা শুনে আমার রাগ ধরে। যখন তখন যেখানে সেখানে প্যান্ট বা শার্ট খুলে ফেলা যায় নাকি?

আমি জেদের সঙ্গে বললাম, না।

আশু বললো, এক্ষুনি ধুয়ে না ফেললে কিন্তু ঐ দাগ আর উঠবে না।

আমার ঘি রঙের প্যান্টে সেই টকটকে লাল পানের পিক একেবারে গাঢ় হয়ে মিশে গেছে। ও আর উঠবে না আমি বুঝেছি। এইটুকু অভিমান নিয়ে আমি বললাম, উঠবে না তো উঠবে না, আমি এটাই পরে থাকবো।

উৎপল বললো, প্যান্টটা খুলে ফেলে শিগগির বাথরুমে নিয়ে গিয়ে ভিজিয়ে দে। তোর ঘেন্না করচে না?

না।

ভাস্কর বললো, কেন পাগলামি করছিস। নিচে আণ্ডার প্যান্ট পরিস নি? প্যান্টটা খুলে ফ্যাল।

—বলছি তো খুলবো না।

তখন তিনবন্ধু চেপে ধরলো আমাকে। যেন ওরা মজা পেয়েছে, কামরার অন্য লোকরা আরও বেশী মজা পেয়ে হাসতে লাগলো। ভাস্কর আমার কোমরে সুড়সুড়ি দিতে বলতে লাগলো, খোল, শিগগির খোল।

আমার জীবনের প্রথম ভ্রমণযাত্রাটি কি সুন্দর হতে পারতো না? এত লোক থাকতে শুধু আমার প্যান্টেই কেন দাগ লাগবে? এত লোকজনের সামনে প্যান্ট খুলে ফেলার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো নয়?

কোনোক্রমে ওদের হাত ছাড়িয়ে আমি ছুটে গেলাম বাথরুমের দিকে।

আমি যে মধুপুরের কথা লিখবো, সেরকম মধুপুর পৃথিবীতে এখন আর কোথাও নেই। সেইরকম মধুপুর মাত্র কয়েক বছরের জন্য থাকে আবার উধাও হয়ে যায়। আমি শত চেষ্টা করলেও সেই মধুপুরে এখন আর যেতে পারবো না। শুধু সতেরো বছর বয়েসেই সেই মধুপুর আমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকে।

আমাদের বাড়িটা ছিল টুকটুকে লাল রঙের। সেই একরকম বাড়ি থাকে, বাইরের দেয়ালে প্লাস্টার থাকে না, ইঁটের ওপরই রং করা, প্রতিটি ইঁট বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। বাড়িটা দোতলা, সামনে একটি বড় গাড়ি বারান্দা। আসলে চতুর্দিকে দেয়াল ঘেরা একটি প্রকাণ্ড বাগানের মধ্যে বাড়িটা বসানো। রেল স্টেশন থেকে সাড়ে তিন মাইল দূরে।

ভাবা যায় কি, গোটা একটা বাড়ি শুধু আমাদের? একতলায় চারখানা ঘর, দোতলায় চারখানা। তার মধ্যে শুধু দোতলার একটি ঘরের চাবি আমাদের দেওয়া হয়নি। সে ঘরে কী আছে আমরা জানি না। আমাদের চারজনের যদিও একটা মাত্র ঘরই যথেষ্ট।

বাড়িটি পাহারা দেয় একজন সাঁওতাল। এখানকার বাগানের ফল ফুল সে-ই ফলায়, সে-ই বিক্রি করে। সে বাবুদের কাছ থেকে আগেই চিঠি পেয়েছে, সুতরাং আমাদের দেখে খাতির করে গেট খুলে দিল। সে লেখাপড়া জানে না, চিঠি পেলে অন্য লোকের

কাছে গিয়ে পড়িয়ে নেয়। কুচকুচে কালো, রীতিমতন লম্বা ও বলশালী এই মানুষটির নাম পরী। এরকম একজন পুরুষের নাম পরী হতে পারে? নাম শুনেই আমরা হেসে উঠি এবং বারবার ওকে ওর পুরো নাম জিজ্ঞেস করি। ও নিজেও হাসে। পরী ছাড়া ওর অন্য নাম নেই। ওর পদবী মাঝি। পরী কথাটা যে কিসের অপভ্রংশ তা আমরা কিছুতেই বার করতে পারি না। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, সাঁওতালরা কেউ কখনো নৌকো চালায় না, এদিকে তার সুযোগই নেই, তবু ওদের অনেকের পদবী মাঝি হয়।

ওর পরী নামটা শুনে প্রথমে যতই অদ্ভুত লাগুক, দু'তিন দিন ঐ নামে ওকে ডাকতে ডাকতে তারপর সেটা খুব স্বাভাবিক হয়ে যায়। তখন পরী বললে আর ডানা লাগানো মেয়ের ছবি চোখে ভেসে ওঠে না, ঐ শক্ত সবল, কালো লোকটিকেই মনে পড়ে।

মানুষের যে-টুকু শুধু প্রয়োজন, তার থেকে অতিরিক্ত কিছু পেলেই মনটা অন্যরকম হয়ে যায়। কলকাতায় আমাদের ছোট ছোট বাড়িতে ঠাসাঠাসি করে থাকতে হয়, মধুপুরে আমাদের চারজনের জন্য গোটা একটা বাড়ির সাতখানা ঘর, অতবড় বাগান, তারপরেও দিগন্ত জোড়া মাঠ ও সীমাহীন আকাশ, এসব পেয়ে আমরা যেন সম্পূর্ণ বদলে গেলাম। আমরা প্রত্যেকেই যেন এক একজন রাজপুত্র।

কোনো নির্বাচনের প্রয়োজন হলো না, ভাস্কর নিজে থেকেই আমাদের দলের নেতা হয়ে গেল। তার কারণ, আমরা চারজনে মিলে যদি এক সঙ্গে চ্যাঁচাতে শুরু করি, তাহলে ভাস্করই শেষ পর্যন্ত জিতবে, ওর গলার জোর সবচেয়ে বেশী। চারজনেই আমরা সমবয়েসী হলেও আশু একটু বেশী লম্বা, কিন্তু তার ভালোমানুষ-স্বভাবের জন্য দলের নেতৃত্বটা সে বিনা দ্বিধায় ভাস্করকে ছেড়ে দিল। উৎপলের বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ তাই সে স্বেচ্ছায় নিয়ে নিল বিরোধী পক্ষের নেতার ভূমিকা। আমি এলেবেলে।

ভাস্কর তক্ষুনি চাল, ডাল, মুর্গী, আলু-পেঁয়াজ, তেল, মশলা আনবার জন্য টাকা দিয়ে দিল। বাড়িটার পেছন দিকে একটা টালির ঘরে পরীর স্ত্রী আর ছেলে মেয়েরা থাকে, তারাই রান্না করে দেবে। ভাস্কর নিজে এসেছে প্রচুর বিস্কুট, কণ্ডেসড মিল্‌ক আর চায়ের প্যাকেট নিয়ে, সুতরাং আমাদের খাওয়া-দাওয়ার কোনো ভাবনা নেই।

জিনিসপত্র নামিয়ে রেখেই আমি বাগানটা দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। এক সময় অনেক ভাল ফুল গাছ ছিল বোঝা যায়, কিন্তু সেগুলির তেমন যত্ন নেই। আর রয়েছে প্রচুর আতা আর পেয়ারা গাছ। আতা গাছের প্রায় জঙ্গলই বলা যায়। একটা চমৎকার বুনো গন্ধ, যেমনগন্ধ কলকাতায় কেউ কখনোপায় না। পাঁচিলের ধার ঘেঁষে অযত্নে ফুটে থাকা অসংখ্য বনতুলসী। একটা এগিয়ে আমি দেখতে পেলাম পরপর দুটি সফেদা গাছ। তাতে সফেদা ফলে আছে পর্যন্ত। তার একটি গাছে বসে আছে একটি চকলেট রঙের বড় ল্যাজ-ঝোলা পাখি। সেই পাখিটা একমনে আমাকে দেখছে।

এই পাখিটাকে আমি চিনি। দমদমে আমাদের মামা বাড়ির অতিথি আসে। এখানে তো আমরাই অতিথি। এই ইষ্টকুটুম পাখিটা নিশ্চয়ই আমাদেরই স্বগতম জানাবার জন্য এখানে বসে আছে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, কেমন আছো?

পাখিটা ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে গেল। আমরা যে এসেছি, সেটা দেখে যাওয়াই যেন ওর কাজ ছিল।

আর একটুখানি এগিয়ে আমি আর একটা জিনিস আবিষ্কার করে ফেললুম। এই বাগানের মধ্যে একটা পুকুরও রয়েছে। পুকুরটা বেশী বড় নয়। কিন্তু বেশগভীর বলেই মনে হয়, জলের রং কালচে ধরনের,মাঝখানে ফুটে আছে কয়েকটা লাল রঙের শালুক। আর তখন আমি শালুক পদ্মের খুব একটা তফাত জানতুম না। তাই প্রথমে পদ্মই ভেবেছিলাম, পরে উৎপল আমার ভুল ভাঙিয়ে দেয়।

দাদা বলেছিল, মধুপুরে জলের ভয় নেই, সে কথা সত্যি নয়। এই তো আমাদের বাড়ির সঙ্গেই একটা পুকুর। কিন্তু আমার একটুও ভয় করলো না, পুকুরটা দেখেই আমি

মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এবং তক্ষুনি মনে মনে সেটাকে 'আমার পুকুর' বলে ঘোষণা করে দিলাম। যা কিছু সুন্দর দেখি, সবই আমার একেবারে নিজস্ব করে নিতে ইচ্ছে করে।

পুকুরটার একপাশে একটা পাথর বাঁধানো ঘাট রয়েছে। এমন নির্জন ছিমছাম পুকুরটা দেখলে অনেকক্ষণ এরপাশে বসে থাকতে ইচ্ছে হয়। আমি ঘাট দিয়ে জলের কাছে নেমে একটু জল ছুঁলাম। দারুণ ঠাণ্ডা। আমার ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো। ভাস্কর আর উৎপল ভালোই সাঁতার জানে। আশুও জানে বোধহয় এরা নিশ্চয়ই আমার এই পুকুরে নেমে দারুণ দাপাপাপি করবে। যাক, আমিও এখানেই চট করে সাঁতার শিখে নেবো।

এবার পুকুরটার চারপাশ একবার ঘুরে দেখলেই বাগানটা দেখা সম্পূর্ণ হয়। যিনি এই বাড়িটা প্রথম বানিয়েছিলেন, তিনি খুব শৌখিন মানুষ ছিলেন নিশ্চয়ই। বাগানের মাঝে মাঝেই রয়েছে সাদা পাথরের বেঞ্চ, তার দু'একটা ভেঙে গেলেও কয়েকটা এখনো আস্ত আছে। কারুর যদি ইচ্ছে হয় এই বাগানে খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার, সেই জন্যই বুঝি ঐ বেঞ্চের ঠিক ওপরেই একটা পেয়ারা গাছের ডাল ঝুঁকে আছে, ওর ওপর উঠে দাঁড়ালেই হাত বাড়িয়ে পেয়ারা পাড়া যায়। দেখা রইলো এখন থাক। প্রত্যেকটা বেঞ্চ আমি হাত দিয়ে একবার ছুঁয়ে গেলাম, কোনো কারণ নেই, এমনিই।

বেলা প্রায় একটা বাজে, মাথার ওপর ঝকঝকে রোদ। নতুন জায়গায় এলেই দারুণ খিদে পায়। পরী চাল ডাল কিনে এনে রান্না চাপাতে কত দেরি করবে কে জানে। ঐ পেয়ারাগুলোরই সদ্ব্যবহার করতে হবে। তার আগেই বাগানের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ছুঁয়ে না এলে বন্ধুদের আগেই পুরো বাগানটা আমার হবে না যে।

বাগানের চারদিকের যে পাঁচিল, তার একটা জায়গা ভাঙা মনে হয়,বাইরের লোকেরা কেউ ইচ্ছে করে ঐ জায়গাটা ভেঙে বাগানের মধ্য দিয়ে যাতায়াতের একটা রাস্তা বানিয়েছে।

সেই ভাঙা জায়গাটা দিয়ে আমি একটু বাইরে উঁকি দিয়েই দারুণ চমকে উঠলাম! আমার বুক কাঁপতে লাগলো।

বাইরেটা ফাঁকা মাঠের মতন, এখানে সেখানে দু'একটা ছাড়া ছাড়া গাছ। সেই রকম একটা বড় গাছে হেলান দিয়ে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। অসম্ভব ফর্সা গায়ের রং, খোলা চুল পিঠে ছড়ানো, একটা হলুদ শাড়ি পরা,লাল রঙের ব্লাউজ, বয়েস চব্বিশ-পঁচিশ মনে হয়, এই আমার বড় মাসী অর্থাৎ রাণু মাসীর সমানই হবেন বোধহয়। এরকম একজন মহিলাকে দেখে আমি ভয় পাবো কেন? তবু ভয় করতে লাগলো। ফাঁকা মাঠের মধ্যে এরকম দুপুরবেলা একজন মহিলা একটা গাছে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, এতে ভয় পাবার কিছু না থাকলেও ওঁর চোখের দৃষ্টি দেখেই ছমছমিয়ে উঠেছিল আমার গা। উনি এক দৃষ্টিতে এদিকেই চেয়ে আছেন, আমাকে দেখতে পেয়েছেন নিশ্চয়ই, অথচ আমাকে দেখতে পাবার কোনো ভাবই ওঁর মুখে ফোটে নি। হঠাৎ কারুকে দেখতে পেলে কেউ ওরকম এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে না, মনে হয় যেন ঐ মহিলার দৃষ্টি আমার শরীর ফুঁড়ে যাচ্ছে।

আমি বলবার চেষ্টা করলুম, কে? কিন্তু বলতে পারলুম না। আমার মনে হলো, এই দুপুরবেলা.....ইনি বোধহয় মানুষ নন....

পেছন ফিরেই আমি একটা দৌড় লাগালাম। বাগানের গাছপালা ভেঙে এক ছুটে সোজা বাড়ি।

॥২॥

বিকেলবেলা আমরা বেরুলুম মধুপুর পরিদর্শন। খেতে খেতেই আমাদের চারটে হয়ে গিয়েছিল, তারপর ঘণ্টাখানেক শুয়ে শুয়ে গুলতানি করে কেটেছে। কী অসম্ভব ভালো মুর্গীর ঝোল রেঁধেছিল পরীর বৌ। ডাল, ভাত,আলু সেদ্ধ ঘি আর মুর্গীর মাংস। আমরা কেউই আগে কখনো এতখানি ভাত খাইনি। এখন থেকে প্রত্যেক দু'বেলা

আমরা কী খাবো, তা আমরা নিজেরাই ঠিক করবো! বাড়ির মতন নয় যে হঠাৎ খেতে বসে দেখবো ট্যাংরা মাছের ঝোল!

মধুপুর শহরে দোকানপাট যা কিছু সব স্টেশনের ধারেই। আসবার সময় আমরা দেখে এসেছি। সেদিকে আর যাবার ইচ্ছে নেই। বাগানটা ঘুরে বাড়ির পিছন দিকের মাঠেই ঘুরে আসার ইচ্ছে প্রকাশ করলো বন্ধুরা। পাথরের বেঞ্চটায় উঠে কয়েকটা পেয়ারা পেড়ে নেওয়া হলো তার আগে। এই পেয়ারাগুলোর জাতই আলাদা, ভেতরটা লাল।

বাগানের বাইরে এসে আমি সেই বড় গাছটার দিকে আড়চোখে তাকালাম। এখন সেখানে কেউ নেই। আমি লজ্জা বোধ করলুম। আমার কি চোখের ভুল হয়েছিল? না, না, তা হতেই পারে না, আমি কলকাতার রাস্তায় প্রায় এক মাইল দূর থেকে বাসের নম্বর পড়ে ফেলতে পারি। কিন্তু দিনের বেলা একজন মহিলাকে দেখে ভয় পেলাম? ছি, ছি, আমি এমনিতেই ভুতের ভয় পাই না কখনো। বন্ধুদের কাছে কথাটা বলতে গিয়েও চেপে গেছি শেষ পর্যন্ত। ওরা শুনলে আর আমার রক্ষে রাখতো না।

কিন্তু কাছাকাছি কোনো বাড়ি নেই, দুপুরবেলা একজন ভদ্রমহিলা ওখানে একা দাঁড়িয়ে কী করছিলেন? কোথা থেকেই বা এলেন। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, ভদ্রমহিলার চোখের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক কিছু একটা ছিল।

দূরে ছোট ছোট দু' একটা পাহাড়ের রেখাচিত্র দেখা যায় আকাশের গায়ে। আমি বন্ধুদের বললাম, চল ওর একটা পাহাড় থেকে ঘুরে আসি।

উৎপল হেসে বললো, ওখানে যেতে আসতে কতক্ষণ লাগবে জানিস? পুরো চব্বিশ ঘণ্টা। অথবা তার বেশীও হতে পারে। পাহাড়গুলো দেখে মনে হয় কাছে, কিন্তু আসলে—।

ভাস্কর বললো, গত বছর আমরা দার্জিলিং-এ গিয়েছিলাম। তখনও উৎপল ভেবেছিল আমরা পাহাড়ে আসিনি। কারণ ওর মতে সব পাহাড়ই দূরে।

উৎপল বললো, ঐ পাহাড়গুলো কত দূরে তুই বলতে চাস? ভাস্কর বললো, বড় জোর এক ঘণ্টা!

উৎপল বললো, তোর মাথা খারাপ। আমি বাজি ফেলে বলতে পারি।

ভাস্কর সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো, কত বাজি?

আশু বললো, তার আগে ঠিক হয়ে যাক হেঁটে না দৌড়ে।

ভাস্কর তক্ষুনি স্টার্ট করতে চাইছিল, কিন্তু আশু বললো যে, ঐ ব্যাপারটা কাল সকালে করলেই ভালো হয়, কারণ আজ একটু বাদেই সন্ধে হয়ে যাবে, তখন পাহাড়ে গিয়েও কোনো লাভ নেই।

আমরা এমনিই হাঁটতে লাগলাম সামনের দিকে। এর মধ্যেই সামনে যতদূর দেখা যায় আকাশটা হলিউডের ওয়েস্টার্ন ছবির আকাশের মতন লাল টকটকে হয়ে গেছে।

খানিকটা দূরে গিয়েই দেখি একটা সরু পাতলা নদী, আর তার ধারে দাঁড়িয়ে দুটি ছেলে রিং নিয়ে খেলছে। দুটি ছেলেই আমাদের চেয়ে ছোট, তেরো থেকে পনেরোর মধ্যে বয়েস, নিশ্চয়ই স্কুলে পড়ে। আমার স্কুলের ছেলেদের একেবারেই দুগ্ধ পোষ্য নাবালক মনে করি।

ভাস্কর সাঁ করে দৌড়ে গিয়ে রিংটা ধরেই ছুঁড়ে দিল ওপরের দিকে। এত জোরে যে মনে হলো সেটা আকাশেই মিলিয়ে যাবে। সেটা নিচের দিকে নামতেই আশু সেটা লুফে নিল, আর সঙ্গে সঙ্গে ছুঁড়ে দিল আমার দিকে। আমার চারজন অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়লাম। ফটাফট করে রিং ছোঁড়াছুড়ি হতে লাগলো, ছেলে দুটি দাঁড়িয়ে রইলো অবাক হয়ে। তারা এত জোরে রিং খেলা তার আগে দেখেনি।

নদীটায় জল বেশী নেই, ভাস্কর ছপছপিয়ে ওপারে চলে গিয়ে বললো, এদিকে দে, এদিকে।

আমি একবার রিংটা হাতে পেয়ে সেই ছেলে দুটির দিকে দিয়ে বললাম, নাও, ধরো।

ওরা ধরতে পারলো না, রিংটা গড়িয়ে গিয়ে পড়লো নদীতে। আশু সেটা কুড়িয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের নাম কী ভাই?

ছেলে দুটির নাম অভিজিৎ আর সঞ্জয়। ওরাও এসেছে কলকাতা থেকে, হেয়ার স্কুলে পড়ে। ওদের বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করতেই ওরা পেছন দিকে দেখিয়ে বললো, এই তো।

আমরা অবাক। সেখানে কোনো বাড়ি আছে বোঝাই যায় না, সেদিকে রীতিমতন বড় বড় গাছের একটি জঙ্গল। আসলে সেটিও একটি বাগান এবং তার ভেতরের বাড়িটি একতলা বলে বাইরে থেকে দেখা যায় না।

অভিজিৎ আর সঞ্জয় এখানে এসেছে দশ দিন আগে। ওরা দেওঘর পর্যন্ত ঘুরেও এসেছে।

এই সব জায়গায় লোকে বেড়াতে আসে সাধারণত বিশেষ সীজনে।

পুজোর কিছু আগে থেকে শুরু হয় সেই সীজন, তারপর সারা শীতকালটা চলে। আনাজ জিনিসপত্র নাকি খুব সস্তা থাকে এখানে এবং জলের এমন গুণ যে পাথর খেলেও হজম হয়ে যায়। আমরা এসেছি ঘোর বর্ষায়। আমাদের ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষা হয়ে গেছে, কলেজে বি এ পরীক্ষার সীট পড়েছে বলে আমাদের এমনিতেই ছুটি। কিন্তু স্কুলগুলো তো এখন বন্ধ নয়। স্কুল নষ্ট করে অভিজিৎ সঞ্জয় এখানে বেড়াতে এসেছে কেন? সে কথা জিজ্ঞেস করা যায় না।

ছেলে দুটির নিয়ে আমরা কিছুক্ষণ বেড়ালুম। একটু বাদেই ঝুপঝুপ করে অন্ধকার নেমে এলো। আমাদের কারুর কাছেই টর্চ নেই। আকাশে পাতলা পাতলা মেঘ, চাঁদের কোনো চিহ্ন নেই।

অভিজিৎ বললো, এখানে কিন্তু সাপ আছে।

সঞ্জয় বললো, আমাদের বাগানে একটা বড় সাপ বেরিয়েছেল পরশুদিন!

সাপের কথা শুনেই আমার পা সুলসুল করে উঠলো। সাপ জিনিসটা আমি একদম পছন্দ করি না। তার চেয়ে বাঘ, সিংহ অনেক ভালো।

ভাস্করও বললো, চল, ফেরা যাক।

অন্য কেউই আপত্তি করলো না।

ফেরার পথে আমরা ছেলে দুটিকে ওদের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে এলাম। বাড়িটার ভেতরে ঝনঝন করে পুজোর ঘণ্টা বাজছে। ছেলেদুটি জানালো যে ঐ বাড়ির মধ্যে একটা কালী মন্দির আছে, রোজ সেখানে পুজো হয়। আমাদের ওরা ভেতরে যেতে বললো, কিন্তু আমরা রাজি হলাম।

অভিজিৎ বললো আপনারা ক্যারাম খেলতে জানেন? আমাদের বাড়িতে ক্যারাম বোর্ড আছে।

উৎপল ক্যারামে চ্যাম্পিয়ন। একবার স্ট্রাইকার হাতে পেলে সে ন' খানা গুঁটি ফেরে দেয়। সে একটু অবজ্ঞার সঙ্গে বললো, কার সঙ্গে খেলবো? তোমাদের বাড়িতে কেউ ভালো খেলতে পারে?

সঞ্জয় বললো, আমরা পারি!

—ঠিক আছে, পরে একদিন এসে দেখবো তুমি কেমন খেলো!

আশু বললো, আমরা ব্যাডমিণ্টনের সেট এনেছি, তোমরা যদি খেলতে চাও, কাল সকালে এসো আমাদের বাড়িতে।

ঘন গাছপালার ভেতরে বাড়িটা প্রায় অন্ধকার। এক জায়গায় মিটমিট করে একটা লণ্ঠন জ্বলছে শুধু। ছেলেদুটি সেই গাছপালার মধ্যে দিয়ে মিলিয়ে গেল।

আমাদের বাড়িতেও যে ইলেকট্রিসিটি নেই, সেটা আমরা আগে খেয়ালই করিনি। ফিরে এসে দেখি আমাদের বাড়িটাও ঘুটঘুটে অন্ধকার।

বাড়ির ভেতর ঢুকে আমরা পরী পরী বলে চেঁচাতে লাগলাম। পরী এলো বেশ দেরি করে। চোখ দুটো লালচে ধরনের, মুখে অদ্ভুত হাসি। হাতে একটা ছোট্ট মোম।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আলো জ্বালো নি কেন?

সে সংক্ষেপে উত্তর দিল, আলো কোথায় পাবো?

—কোথায় পাবো মানে? আলো নেই?

—বাবুরা তো এধারে বিজলিবাতি আনে নি!

মধুপুর শহরে ইলেকট্রিসিটি থাকলেও এ বাড়িটা শহর থেকে বেশ দূরে। আর যেহেতু বাড়ির মালিকরা বছরে একবার মাত্র আসে কয়েক দিনের জন্য, তাই খরচ করে ইলেকট্রিক আনে নি।

দিনের বেলা পরী ছিল অতি বিনীত ও নরম প্রকৃতির। রাত্তির-বেলা সে যেন খানিকটা বদলে গেছে। বাবু বলে আমাদের খাতির করতে চাইছে না। আমরা কি অন্ধকারে থাকবো? আমাদের জন্য যে একটা আলোর ব্যবস্থা করতে হবে, সে চিন্তাই যেন ওর মাথায় নেই।

পরপর দু'রাত্তির পরীর এই রকম ব্যবহার দেখে আমরা রহস্যটা বুঝেছিলাম। সে দিনেরবেলা এক রকম থাকে আয় রাত্তিরবেলা বদলে যায়। আসলে সন্ধে হলেই সে মহুয়া খেয়ে নেশায় টং হয়ে থাকে।

ভাস্কর একটু কড়া গলায় বললো, বিজলি বাতি নেই তো লণ্ঠন টণ্ঠন কী আছে জ্বালো?

পরী জানালো যে বড় বড় হ্যাজাক লণ্ঠন বাবুরা দোতলার একটা ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে গেছে। সে ঘরের চাবি তার কাছে নেই।

—তাহলে আমরা কি অন্ধকারে থাকবো নাকি সারা রাত?

—আপনারা মোমবাতি আনেন নি?

আমরা কি কলকাতা থেকে মোমবাতি কিনে আনবো নাকি? দুপুরে যখন বাজারে যায়, তখন পরীরই আনা উচিত ছিল খেয়াল করে। রান্না ঘরে একটা মাত্র হারিকেন আছে। সেটাও পরী আমাদের দিতে পারবে না,কারণ তা হলে রান্না হবে কী করে? তার কাছে ঐ টুকরো কোনোক্রমে সিঁড়ি পার হয়ে ওপরে এসে ভাস্কর আরও আশু ওদের সুটকেশ থেকে দুটো টর্চ বার করলো। তারপর ভাস্কর পরীকে একটা পাঁচ টাকার নোট দিয়ে বললো, যাও, অনেকগুলো মোমবাতি নিয়ে এসো বাজার থেকে।

পরী সেই যে গেল, রাত দশটার আগে আর ফিরলো না।

আমাদের দলের মধ্যে শুধু উৎপলের হাতেই একটা ঘড়ি আছে। ওটা ওর নিজের। দলের নেতা হিসেবে ভাস্কর ঐ ঘড়িটা নিজের হাতে পরতে চেয়েছিল, উৎপল রাজি হয় নি।

সর্বক্ষণ টর্চ জ্বেলে বসে থাকা যায় না। আবার টর্চ নেভালেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। কেউ কারুর মুখ দেখতে পাই না। চতুর্দিক দারুণ নিস্তব্ধ, তবু এরই মধ্যে ছাদের কাছে একটা প্যাঁচা হঠাৎ ডেকে উঠলেই আমার বুক কেঁপে ওঠে। অথচ, আমরা কেউই ভীতু নই। নতুন জায়গায় অন্ধকার মানিয়ে নিতে একটু সময় লাগে, তার আগে ভয় ভয় ভাবটা যায় না।

আমার বারবার মনে পড়তে লাগলো, দুপুরবেলা দেখা সেই মহিলার কথা। এখন সেই মূর্তিটিকে আরও অবাস্তব মনে হচ্ছে। যেন হঠাৎ গাড়ি বারান্দার কাছে হঠাৎ আবার দেখতে পাবো। সেই কথাটা বলার জন্য বুকের মধ্যে আকুলি বিকুলি করছিল, তবু কিছুতেই মন ঠিক করতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত যে বলিনি, তাতেই আমি জিতে গেছি।

আমাদের সতেরো বছর বয়েসে কলাতায় লোড শেডিং নামে কিছু ছিল না। ঘুমের মধ্যে ছাড়া,একটানা বেশীক্ষণ অন্ধকার দেখার অভিজ্ঞতা আমাদের কারু নেই। অন্ধকারের মধ্যে গল্পও জমে না।

ভাস্কর একসময় বলে উঠলো, ধুৎ, ভালো লাগছে না। আয় তো আমার সঙ্গে।

টর্চ জ্বেলে আমরা বারান্দায় অন্য প্রান্তে বন্ধ ঘরটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। মস্ত বড় পেতলের তালা। এই ঘরের মধ্যে রয়েছে বড় বড় হ্যাজাক! তার একটা জ্বালতে পারলেই আলোর কোনো সমস্যা হতো না। নাড়া চাড়া করে করে দেখা গেল তালাটা খোলা সহজ নয়।

ভাস্করদের যে আত্মীয়দের বাড়ি এটা, তাঁদের একটি ছেলের নাম নৃসিংহ। তাকে আমরাও সবাই চিনি। নৃসিংহ কেন আমাদের এই ঘরটার চাবি দেয় নি? আমরা কি ওদের জিনিসপত্র নিয়ে নিতাম?

ভাস্কর বেগে দরজাটার গায়ে একটা লাথি মেরে বললো, তোদের মধ্যে কেউ যদি এই তালাটা খুলতে পারিস তা হলে আমি তার পায়ের ধুলো নেবো।

ভাস্করকে আমাদের পায়ের ধুলো দেবার জন্য আমি আর আশু খুব চেষ্টা করলাম। কিছুই লাভ হলো না। উৎপল শুধু বললো, একটা পেরেক পেলে আমি খুলে দিতাম।

সেই অন্ধকারে তাকে অবশ্য পেরেক যোগাড় করে দেওয়া গেল না।

পরী ফিরলো রাত দশটার পর, খুব চেঁচিয়ে গান গাইতে গাইতে। তার হাতে সরু সরু তিনটে মাত্র মোম, পাঁচ টাকা দিয়ে সে ঐ মোম তিনটে কিনতে পেরেছে। মধুপুরে যে মোমে এত দাম, তা তো আমরা জানতাম না। পরীকে সে কথা জিজ্ঞেস করতে সে বললো, হ্যাঁ, বাবু, ইয়ে মধ্‌ধুপুর হ্যায়, সব চীজ মাঙা। তারপরই সে হেসে উঠলো হাহা করে।

তার সঙ্গে আর তর্ক করা গেল না। রাত্তিরের খাওয়া অতি সাধারণ, নিরামিষ, ভাত, ডাল, আলু ভাজা আর বেগুন পোড়া। তবে, এখানকার ঘিতে ভারী চমৎকার গন্ধ।

ওপরে উঠে এসেই আমরা শুয়ে পড়লুম। এত সরু মোমের আলোয় বই পড়া যাবে না, তাসটাসও খেলা যাবে না। এতক্ষণে আকাশে জ্যোৎস্না ফুটলো না দেখে আমি একটু মনঃক্ষুণ্ন হলুম। আমার মেঘ ভালো লাগে, কিন্তু রাত্তিরবেলা আকাশ মেঘলা থাকলে আকাশটাই দেখা যায় না, সেটা ভালো লাগে না।

ঘরে দু'খানা খাট ছিল, আমরা সে দুটোকে টেনে এনে জুড়ে দিয়ে সবাই এক সঙ্গে শুয়েছি। ঠিক সামনেই একটা জানলা। একটুক্ষণ শুয়ে থাকার পর আশু বললো, ঐ জানলাটা বন্ধ করে দেবো?

উৎপল বললো, হঠাৎ বৃষ্টি আসে?

—সে যখন বৃষ্টি আসবে তখন দেখা যাবে। এই গরমের মধ্যে জানলা বন্ধ করার কোনো মানে হয়?

আশু তখন সরল ভাবে কাঁচুমাচু গলায় বললো, ভাই, সত্যি কথা বলছি, ঐ জানলাটার দিকে তাকালে আমার একটু ভয় করছে। মনে হচ্ছে, এক্ষুনি যেন একটা মুখ দেখতে পাবো। যতই অন্য কথা ভাবছি—

একজন কেউ ভয়ের কথা বললেই অন্যরা সাহসী হয়ে যায়। আমরা সবাই মিলে অমুকে রাগাতে লাগলুম। আশু বললো, ঠিক আছে বাবা, আমি উপুড় হয়ে শুচ্ছি!

আবার খানিক বাদে উৎপল উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর ভাবে বললো, আমার ছোট বাথরুম পেয়েছে, কেউ আমার সঙ্গে যাবি?

বাথরুমটা একতলায়, ইঁদারার পাশে। আমিও খাওয়ার পর হিসি করতে ভুলে গেছি, বেশ পেয়েছে, কিন্তু অন্ধকারে ঐ অতদূর যেতে হবে বলে চেপে যাচ্ছিলুম। এবার উৎপলের সঙ্গে যাবার জন্য উঠে বসতেই ভাস্কর উৎপলকে বললো, কেন, তুই ভয় পাচ্ছিস বুঝি? একলা যেতে পারছিস না?

উৎপল বললো, কেন ভয় পাবো? আমি জিজ্ঞেস করছিলাম আর কেউ যাবে কিনা!

উৎপল ফিরে এলো বড্ডই তাড়াতাড়ি। এত কম সময়ে একতলায় গিয়ে বাড়ির বাইরে বাথরুম থেকে ঘুরে আসা যায় না।

ভাস্কর বললো, তুই না করেই ফিরে এসেছিস।

উৎপল বললে, বাঃ, গেলুম আমি আর অমনি অমনি ফিরে আসবো?

আশু বললো, ও নিচে যায় নি। পাশের ছাদে—

উৎপল বললো, ভ্যাট্।

আশু পাশ ফিরে উৎপলের পেটটা দু'হাত দিয়ে টিপে ধরে জিজ্ঞেস করলো, সত্যি করে বল।

তখন আমরাও ঝাঁপিয়ে পড়লুম উৎপলের ওপর। সারা খাট জুড়ে হুটোপুটি। প্রচণ্ড কাতুকুতু পেয়ে উৎপল স্বীকার করতে বাধ্য হলো।

আমি লাফিয়ে উঠে বললুম, আমিও তাহলে পাশের ছাতে যাবো। সঙ্গে সঙ্গে এলো, ভাস্কর আর আশু।

একটু একটু ভয়েঙ্করী চমৎকার শিরশিরে নেশা। ভয় পাবার মতন আমরা কিছুই দেখিনি, কিছুই হয়নি তবু, শরীরটা ছমছম করে। দূরে কোথায় টি ট্রি টি ট্রি করে একটা রাত পাখি ডাকছে। এ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

ফিরে এসে একটু বাদেই আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। মাঝ রাতে এমনিই বিনা কারণে একবার ঘুম ভেঙে গেল। সামনের খোলা জানলাটার দিকে তাকিয়ে দেখি, আকাশের মেঘ কেটে গেছে, বোধহয় চাঁদও উঠেছে, ঝকঝক করছে অসংখ্য তারা। আকাশ যে আমার মনের কথাটা বুঝেছে, এ জন্য দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে একটা ধন্যবাদ দিয়ে, পাশ ফিরে সুখী হৃদয়ে আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালবেলা জেগে উঠেই মনে হলো, ইস, সারা রাতটা শুধু ঘুমিয়ে এমনি এমনিই কেটে গেল? কোনো ঘটনা ঘটলো না? একটা ভূত টুত এলে মন্দ হতো না!

আশু আর উৎপল আগেই উঠে গেছে, আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ওরা হাসতে লাগলো, তারপর ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললো, চুপ!

আমি ঘুমন্ত ভাস্করের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। ভাস্করের নাকের নিচে কার্তিক ঠাকুরের মতন পুরুষ্টু গোঁফ, গালে দাড়ি। ভাস্করের ফর্সা মুখটায় ঐ কালো রং খুলেছে বেশ ভালো। এখন ওকে একটা ময়ূরের পিঠে বসিয়ে কাঁধে তীর ধনুক ঝুলিয়ে দিলেই হয়।

ভাস্করকে না জাগিয়ে আমরা পাশের ছাদে গিয়ে খুব হাসতে লাগলুম।

দারুণ সুন্দর সকাবেলাটা। ঝকঝক করছে রোদ। দূরের সেই জঙ্গলের মতন বাগান বাড়িটা থেকে টুং টুং শব্দ আসছে পুজোর ঘণ্টার। সামনের রাস্তা দিয়ে একটা গোরুর গাড়ি যাচ্ছে ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ করে। এক ঝাঁক শালিক ঝগড়া করছে সামনের বাগানে। এই সব শব্দই যেন এক তারে বাঁধা।

বাগান থেকে পরী জিজ্ঞেস করলো, চা দেবো?

আমরা শোওয়ার ঘরে বসেই চা খেতে লাগলুম। নিচের ডাইনিং হলে যেতে আলস্য লাগছে। ভাস্করের দিকে তাকিয়ে আমরা হাসি চাপতে পারছি না, মাঝে মাঝে দম ফাটা হাসি বেরিয়ে আসছে। ভাস্কর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে?

আমরা বললাম, কিচ্ছু না তো!

ভাস্কর গম্ভীর হয়ে গেল। চারজনের মধ্যে আমরা তিনজনে একদলে গিয়ে ওকে আলাদা করে দিয়েছি ভেবে ও রাগতে লাগলো ভেতরে ভেতরে। একবার ও গালটা চুলকালো, কিন্তু ওর আঙুলে যে রং লেগে গেছে, তা টেরও পেল না।

খানিকটা বাদে আমরা নিচে নেমে ইঁদারার পাশে গিয়ে মুখ ধুলাম। আয়না তো নেই যে বাস্কর নিজের মুখে দেখতে পাবে। উৎপল ইঁদারার ধারে গিয়ে মুখ ঝুঁকিয়ে বললো, এটা কত গভীর রে? দ্যাখ দ্যাখ ভাস্কর।

ভাস্কর এক পলক মাত্র ইঁদারাটা দেখলো। অনেক নিচে জলের ওপর ওর মুখের ছায়া পড়লেও তাতে দাড়ি গোঁ বোঝা যায় না। ভাস্করের এখনো ভালো করে ঘুম কাটে নি, সে বললো, দারুণ খিদে পেয়ে গেছে। তোদের পায়নি। পরীকে বল ডিম ভাজা আর পরোটা করতে!

চোখ মুখ ধোওয়ার পর ভাস্করের মুখের কালি সামান্য মাত্র উঠেছে, গোঁফটা পুরোপুরি অক্ষতই আছে।

ডাইনিং রুমে এসে আমরা বসেছি, হঠাৎ বৃষ্টি নামলো। এই আকাশ পরিষ্কার ছিল, কোথা থেকে এসে গেল মেঘ। এই সব শুকনো জায়গায় হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টি হয়। আজ সকালে আমাদের পাহাড় দেখতে যাবার কথা ছিল, বৃষ্টি কখন থামবে কে জানে।

এই বৃষ্টির মধ্যেই ক্রিং ক্রিং করে সাইকেলের বেল বাজিয়ে সেই কালকের ছেলে দুটি হাজির। গায়ে ঝকঝকে নীল রঙের রেইন কোট। শালপাতায় মোড়া একা ঠোঙা হাতে ভেতরে ঢুকে তারা বললো, আপনাদের জন্য প্রসাদ এনেছি।

তারপরই ভাস্করের দিকে তাকিয়ে হি-হি করে হাসতে হাসতে বললো, ওমা, আপনার মুখে।

আমি, আশু আর উৎপল হাসতে হাসতে পেট চেপে মাটিতে বসে পড়লাম, কিছুতেই হাসি থামাতে পারি না, হাসতে হাসতে বুঝি মরেই যাবো!

এত তুচ্ছ কারণে এত অফুরন্ত পরিষ্কার হাসি বুঝি শুধু সতেরো বছর বয়সেই সম্ভব।

ভাস্কর অতি স্মার্ট ছেলে। প্রথমে একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে রইলো। তারপর দৌড়ে ওপরে গিয়ে সুটকেশ থেকে নিয়ে এলো ছোট আয়না, আসল ব্যাপারটা বুঝেও ও কিন্তু তক্ষুনি মুখ মুছলোও না বা রাগও করলো না। নানা রকম মুখ ভঙ্গি করে ও ছেলে দুটিকে আরও মজা দেখাতে লাগলো। কখনো চোখ পাকিয়ে অসুর সাজছে, কখনো ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে জেনারেল কারিয়াপ্পা!

বৃষ্টি আরও জোরে এসে গেল। আজ সকালে আর বেড়াতে যাবার আশা নেই। ডিম ভাজা অবশ্য গেল না, তবে পরোটা আর বেগুন ভাজা দিয়ে আমার ব্রেক ফ্রাস্ট সারা হলো।

ভাস্কর বললো, একটা সাইকেল থাকলে এখানে খুব সুবিধে। নিজেরাই বাজার থেকে অনেক কিছু কিনে আনতে পারি।

উৎপল বললো, বিশেষ করে আজ আলোর কিছু ব্যবস্থা করা দরকার। পাঁচ টাকার তিনটে সরু সরু মোমবাতি দিয়ে আমাদের পোষাবে না।

অভিজিৎ বললো, আপনারা ক্যারাম খেলবেন বলেছিলেন, আমাদের বাড়িতে চলুন না।

উৎপল বললো, এই বৃষ্টির মধ্যে কী করে যাবো ভাই?

আশু বললো, বরং তোমাদের সাইকেলটা একটু দেবে? আর তোমাদের একজনের রেন কোটটাও একটু ধার নিচ্ছি, আমি চট করে একবার শহরের দিক থেকে ঘুরে আসছি।

আমাদের সকালের খাবার দাবার দিয়ে গেছে পরীর বউ, আর একটি সাতআট বছরের বাচ্চা ছেলে। পরীর আর পাত্তা নেই। বোধহয় কাল রাত্তিরের ব্যবহারের জন্য লজ্জা পেয়েছে।

ভাস্কর শার্টের পকেট থেকে মানি ব্যাগ বার করে কিছু টাকা আশুকে দিয়ে বললো, ডিম ফিম কিনে আন তো। সকাল বেলা ডিম না খেলে আমার মনে হয় কিছু খাওয়াই হয় নি।

আশু ফিরে এলো খুব তাড়াতাড়ি। পথেই তার সঙ্গে পরীর দেখা হয়ে গেছে। এই বৃষ্টির মধ্যেই ভিজে পরী হাতে একটা বড় মাছ ঝুলিয়ে নিয়েছে, আর একটা পুঁটলিতে এক ডজন ডিম। এসবই সে এনেছে ধারে।

পরীর মুখে ঠিক কালকের মতন বিনীত, নরম হাসি। মাছ আর ডিমের দাম যা বললো, একেবারে অবিশ্বাস্য রকমের শস্তা। আমরা তখুনি ঠিক করে ফেললাম, পরীকে দিয়ে আমরা যা কিছু বাজার করার দিনের বেলাই করাবো। রাত্তিরের দিকে ওর হাতে একদম টাকা দেওয়া হবে না।

ভাস্কর বললো, লাগাও ডিম ভাজা আর আর এক রাউণ্ড চা!

উৎপল এর মধ্যে এক প্যাকেট তাস এনে অভিজিৎ আর সঞ্জয়কে নানারকম ম্যাজিক দেখিয়ে অবাক করছিল। আশুকে ফিরতে দেখেই বললো, এবার কিন্তু ব্রীজ খেলা হবে।

উৎপলটা একেবারে তাসের পোকা। হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষার পরের ছুটিতে আমরা ব্রীজ খেলা শিখেছি। বাইরে বেড়াতে এসে আমার তাশ খেলতে ইচ্ছে করে না। এমনকি বৃষ্টি ভিজে ভিজে বেড়াতেও আমি রাজি। কিন্তু উৎপল কিছুতেই ছাড়বে না। তাশ খেলার চার নম্বর সঙ্গ হবার জন্যই তো ওরা আমায় এনেছে।

অভিজিৎ আর সঞ্জয় খানিকক্ষণ উৎসুক হয়ে বসে রইলো আমাদের পাশে। কিন্তু কতক্ষণ আর ওদের ধৈর্য থাকবে। ওরা বেচারিরা এসেছিল আমাদের সঙ্গ পেতে। কিন্তু ব্রীজ খেলার মাঝখানে কোনো কথা চলেনা, শুধু টু হার্টস আর থ্রি নো ট্রাম্পস। আর একটা খেলা শেষ হলেই তর্ক। কুক্ষণে আমি উৎপলের পার্টনার হয়েছিলাম, প্রায়ই ভুল ডাক দিয়ে বকুনি খেতে লাগলাম।

অভিজিৎ আর সঞ্জয় কখন উঠে গেছে পাশ থেকে খেয়াল করিনি। হঠাৎ বাইরে গলা ফাটানো চিৎকার। সাঙ্ঘাতিক ভয় পেয়ে সঞ্জয় আমাদের ডাকতে ডাকতে আসছে।

আমরা তাশ ফেলে হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সঞ্জয় এত ভয় পেয়ে গেছে যে খালি বলছে, দাদা, আমার দাদা!

সে হাত দিয়ে দেখাচ্ছে বাগানের পেছনের দিকটা, আমরা সেদিকে ছুটতে শুরু করতেই সঞ্জয় বললো, দাদা জলে ডুবে গেছে।

ভাস্কর, আশু, উৎপল ঝপাঝপ লাফিয়ে পড়লো পুকুরে। আমার ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, শিগগির আমি সাঁতার শিখে নেবোই নেবো।

অভিজিৎকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কতক্ষণ আগে সে ডুবে গেছে কে জানে! আমি ভয়ে চোখ বুজে ফেললাম। আমি এ পর্যন্ত কোনো মৃত্যু দেখিনি। আমি দেখতেও চাই না।

পরক্ষণেই আমার অনুতাপ হলো। ছিঃ, আমি এত স্বার্থপর। আমি মৃত্যু দেখতে চাই না বলে চোখ বুঝে আছি। তার মানে আমি ধরেই নিয়েছি অভিজিৎ বাঁচবে না। অভিজিতের বদলে যদি আমি জলে ডুবে যেতাম, তাহলে কি আমিও মরতাম?

ঠাকুর দেবতার কথা আমার খুব একটা মনে পড়ে না। তবে পরীক্ষা দেবার সময় সরস্বতীর কাছে প্রার্থনা জানাই প্রত্যেকবার। জলে-ডোবা মানুষকে উদ্ধার করার জন্য সরস্বতী ঠিক যোগ্য দেবী কি না সে কথা বিচার না করে আমি চোখ খুলে ব্যাকুলভাবে বলতে লাগলাম, হে স্বরস্বতী, বাঁচিয়ে দাও, সব বাঁচিয়ে দাও!

চ্যাঁচামেচি শুনে পরীও এসে পড়লো এবং লাফিয়ে পড়লো। ভাস্কর আর আশু এর মধ্যেই অভিজিতকে খুঁজে পেয়েছিল, পরী দক্ষ হাতে ওপরে তুলে আনলো তাকে।

অভিজিতের চোখ খোলা, শরীরটা মৃগী রুগীর মতন কাঁপছে। ওকে উপুড় করে শুইয়ে ওর পেটে চাপ দেওয়া হতে লাগলো, পরী দুর্বোধ্য হিন্দীতে কাকে যেন গালাগালি দিয়ে চলেছে।

আমরা সবাই দারুণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু ভাস্কর এই সময় দলনেতার ভাবযুক্ত একটা কথা বললো।

ভাস্কর বললো, আশু, উৎপল ওকে তোল, ওকে এক্ষুনি ওর বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে ডাক্তার ডাকা দরকার।

সঙ্গে সঙ্গে ওরা অভিজিতকে তুলে নিয়ে ভাঙা পাঁচিলের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি সঞ্জয়ের হাত চেপে ধরে বললাম, এসো। সঞ্জয় কান্না থামিয়ে এখন বোবা হয়ে গেছে।

ছুটতে ছুটতে মাঠটা পেরিয়ে সঞ্জয়দের বাড়িতে এসে পৌঁছোতে আমাদের বেশী সময় লাগলো না। আমরা ঢুকলাম পেছন দিক দিয়ে।

বড় বড় গাছগুলোর মধ্য দিয়ে যেতে যেতে আমাদের আর একবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়তেই হলো।

একটা লিচু গাছের নিচে একটা কাঠের বেঞ্চির ওপর বসে আছেন এক মহিলা। স্থির, যেন পাথরের মূর্তি। চোখ দুটি সামনের দিকে, মনে হয় যেন পলকও পড়ছে না।

কোনো সন্দেহ নেই, কাল দুপুরে আমি এই মহিলাকে দেখেছিলাম আমাদের বাড়ির কাছে। সেই হলদে শাড়ি, কালো ব্লাউজ।

আমরা গাছ-পালা ভেদ করে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসাছি, তবু সেই মহিলা একবারও তাকালেন না আমাদের দিকে, এক গোছা রঙীন ফুলের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। যেন তিনি ধ্যান করছেন। বৃষ্টি এখন খুব ঝিরিঝিরি করে পড়লেও একেবারে থামে নি। মহিলা বৃষ্টিতে ভিজছেন, তবু যেন হুঁশ নেই। আমি সঞ্জয়কে জিজ্ঞেস করলাম, উনি কে?

সঞ্জয় বললো, আমার দিদি।

কিন্তু এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও সঞ্জয় তার দিদিকে জানানোর প্রয়োজন মনে করলো না। আবার আমরা ছুটে গেলাম ওদের বাড়ির দিকে।

॥৩॥

ডাক্তার ডাকতে হয়নি, সঞ্জয়ের বড় মামা অভিজিতকে শুইয়ে দিলেন কালীমূর্তির সামনে। তারপর নিজেই চিকিৎসা করতে লাগলেন।

আধঘণ্টার মধ্যেই অভিজিত বললো, মা!

সঞ্জয়ের বড়মামাকে দেখলে ভক্তিও হয়,ভয়ও জাগে একটু। মিশমিশে গায়ের রং, বিশাল লম্বা। বাঙালীর মধ্যে অত কারো আমি আগে কখনো দেখিনি। একটা গেরুয়া লুঙ্গি পরা, সম্পূর্ণ খালি গা, দুই বাহুতে রুদ্রাক্ষের মালা। দেখলে ঠিক সিনেমার কাপালিকের মতন মনে হয়, কিন্তু তিনি মা কালীর সামনেই সিগারেট খাচ্ছিলেন, সেটাই যেন একটু বিসদৃশ। কাপালিকেরা তো গাঁজার কলকে টানে।

তিনি আমাদের বললেন,যাক,ছেলেটার একচা জলের ফাঁড়া ছিল, আজ কেটে গেল কতবার বারণ করেছি ও বাড়িতে যেতে, ওখানে পুকুর আছে। তা শুনবেই বা কেন, জলই তো ওকে টেনেছিল। তোমাদের মধ্যে কে ওকে বাঁচিয়েছো?

উৎপল কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই আশু বললো, আমাদের বাড়ির যে চৌকিদার, পরী, সে-ই ওকে তুলেছে।

কোনো ব্যাপারে গর্ব করা একদম আশুর ধাতে নেই।

বড়মামা বললেন, তোমরা তখন পুকুরে চান করছিলে বুঝি?

এবার উৎপল বলে ফেলো, না, আমরা তাশ খেলছিলাম, হঠাৎ সঞ্জয়ের চিৎকার শুনে আমরা গিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আমিই প্রথমে ওকে জলের তলায় পেলাম।

আশা আবার বললো, পরী ঠিক সময় এসে না পড়লে, কী যে হতো বলা যায় না। ছেলেটা কখন একলা গিয়ে পুকুরে নেমেছে।

বড়মামা বললেন, ঐ যে বললাম, ফাঁড়া ছিল, জল তো ওকে টানবেই। ও বাড়িটা তো সারা বছর খালি পড়ে থাকে, ভাগ্যিস তোমরা ছিলে! যাক, আর কোনো চিন্তা নেই। দা ডেঞ্জার ইজ ওভার। তোমরা বসো, তোয়ালে দিচ্ছি, মাথাটাথা মুছে ফেল।

জলে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে ভাস্করই একমাত্র ঝট করে নিজের শার্টটা খুলে ফেলেছিল। আশু আর উৎপলের পুরো পায়জামা শার্ট পরা। এক্ষুনি সব ছেড়ে ফেলা দরকার। কিন্তু ওঁরা জোর করে আমাদের মিষ্টি খাওয়াবেনই। আমরা খানিকটা আগেই এক গাদা খাবার খেয়েছি, তবু চারটে করে সন্দেশ খেতেই হলো।

অভিজিতের মা প্রথম দিকটায় খুব কান্নাকাটি করছিলেন। এখন শান্ত হয়ে গেছেন। অভিজিৎকে তিনি গরম দুধ খাওয়াচ্ছেন।

ওর মায়ের বেশ মা মা চেহারা। মুখে একটা স্নিগ্ধভাব আছে। একটা চওড়া লাল পাড়ের সাদা শাড়ি পরা। ছেলের সেবা করতে করতেই উনি বারবার বলতে লাগলেন, বাড়ির তৈরি সন্দেশ, খাও, একটাও রাখবে না....তোমরা না থাকলে আজ কী যে হতো!

অভিজিৎ উদ্ধার পর্বে আমার যদিও কোনো ভূমিকা নেই, তবু আমাকেও সন্দেশ খেতে হলো। অবশ্য, আমি যে সরস্বতীকে ডেকেছিলাম, তাতেও তো কাজ হতে পারে। সরস্বতীও তো জলেরই দেবী, এতক্ষণে আমার মনে পড়েছে, ওর নমের মানেতেই তো বোঝা যায়।

এত কাণ্ডের মধ্যেও সঞ্জয়ের দিদিকে একবারও খবর দেওয়া হলো না কিংবা কেউ তাঁর কথা উল্লেখই করছে না দেখে আমি ক্রমশ দারুণ অবাক হচ্ছিলাম।

অভিজিৎ আর সঞ্জয়ের আর এক দিদি আছে। সে প্রায় আমাদেরই বয়সী, তার নাম ঝুমা। পরে জেনেছি, সেও ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, কিন্তু সেদিন সে আমাদের সঙ্গে কোনো কথা বললো না।

একটুক্ষণ কথাবার্তাতেই আমরা জানলাম যে সঞ্জয়ের বড়মামা এখানে বারো মাসই থাকেন। তিনিই এই কালীমন্দিরের পূজারী। মাঝে মাঝে ওঁর মুখে ইংরিজি কথাবার্তা শুনে মনে হয়, উনি বেশ লেখাপড়াও জানেন, নিছক গ্রাম্য কাপালিক নন। উনি খুব ঘন ঘন চা আর সিগারেট খান। সঞ্জয়রা এখানে বেড়াতে এসেছে, সঞ্জয়ের বাবার অফিসে খুব জরুরী কাজ আছে বলে তিনি ওদের ওখানে রেখে ফিরে গেছেন কলকাতায়, তবে প্রত্যেক সপ্তাহে একবার করে আসেন।

আমরা বসেছিলাম মন্দিরের ঢাকা দালানে। বৃষ্টি থেমে গেছে। এই সময় সেখানে এলেন সেই যুবতী। অসহ্য সুন্দর তাঁর রূপ। ঠিক যেন জ্যান্তদেবী সরস্বতী। শুধু মুখখানায় বিষাদ মাখানো। এমন সুন্দর অথচ এমন দুঃখী মুখ আমি কখনো দেখিনি।

তিনি সেখানে দাঁড়াতেই সঞ্জয়ের মা আস্তে করে বললেন, আয় রাণু, বোস।

মহিলা আমাদের দিকে একপলক শুধু তাকিয়ে দেখলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, খোকনের কি হয়েছে মা? ও ঠাকুরে সামনে শুয়ে আছে কেন?

মা বললেন, খোকন যে জলে ডুবে গিয়েছিল। এই ছেলেরা ওকে বাঁচিয়েছে।

অভিজিতের দিদি মুখখানা একেবারে বদলে গেল। দারুণ ভয় পেয়ে বললেন, অ্যাঁ, জলে ডুবে গিয়েছিল? খোকন, খোকন!

মহিলাটি একেবারে যেন অভিজিতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে তুলে নিতে গেলেন। মা তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, থাক, থাক, রাণু ও এখন একটু শুয়ে থাক।

তিনি হাটু গেড়ে বসে রইলেন অভিজিতের সামনে।

আমি একদৃষ্টে শুধু ঐ মহিলাকেই দেখছিলাম, অন্য কিছু খেয়াল করিনি, ভাস্কর আমার হাত ধরে টেনে, বললো, চল, বাড়ি যাবি না। আমাদের জামা কাপড় ছাড়তে হবে।

আশ্চর্য ব্যাপার, সঞ্জয়ের দিদি আমার রাণু মাসীর বয়েসী, আর এঁর নামও রাণু। অবশ্য রাণু মাসীর সঙ্গে এর চেহারার কোনো মিল নেই।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। সঞ্জয়ের বড়মামা আমাদের সঙ্গে এলেন খানিকটা। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কদিন থাকবে?

ভাস্কর বললো, আট দশ দিন।

তিনি বললেন, তোমরা বললে, তোমরা তাশ খেলছিলে। ব্রীজ জানো নাকি?

উৎপল সঙ্গে সঙ্গে বললো, হ্যাঁ। অকশান, কনট্রাক্ট দুটোই জানি।

বড়মামা বললেন, আমারও খুব তাশ খেলার শখ। এখানে সব সময় সঙ্গী পাই না। দুপুরে দিকে চলে এসো না; খেলা যাবে।

উৎপল সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি জানালো।

ওবাড়ি ছাড়িয়ে মাঠটা পেরিয়ে আসতে আসতে আমি বললাম, সঞ্জয়ের দিদি কী রকম একটু অদ্ভুত না? কতক্ষণ পরে এলেন, তারপর আমাদের সঙ্গে একটাও কথা বললেন না।

ভাস্কর বললো, উনি তো পাগল!

আমি চমকে উঠে বললাম, পাগল? যাঃ! তুই কি করে জানলি?

ভাস্কর বললো, ও তো চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যয়। দেখলি না কী, রকম ফাঁকা ফাঁকা দৃষ্টি। আ'হা, এত সুন্দর দেখতে!

আমি কিছুতেই মানতে চাইছিলাম না। কিন্তু দেখা গেল আশু আর উৎপলও ভাস্করের কথাই বিশ্বাস করছে।

আমার মনটা যেন মুষড়ে গেল। পাগল শুনলেই ভয় হয়। কোনো পাগল সম্পর্কে আগে আমার অন্য কোনো অনুভূতি হয় নি, এই প্রথম বেদনা বোধ করলাম।

আমাদের বাগানে ঢুকে পুকুরটার পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগলাম আমরা। পুকুরের জল এখন শান্ত, নিথর, মাঝখানের লাল শালুকগুলোর ওপর কয়েকটা ফড়িং ওড়াউড়ি করছে। দেখলে বোঝাই যায় না যে একটু আগে একটা কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছিল। একটা সুন্দর প্রাণ সামান্য কারণে নষ্ট হয়ে যেত।

ভাস্কর বললো, পুকুরটা ছোট হলে কী হয়, বেশ গভীর আছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ভাস্কর, মানুষ কেন পাগল হয় রে?

ভাস্কর বললো, কী জানি?

আমি অন্য বন্ধুদের দিকে তাকালাম। ওরাও জানে না।

পুকুরের এ পাশে একটা ইউক্যালিপটাস গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে রাখা আছে অভিজিতের সাইকেলটা। সেটা দেখেই সেদিকে আমরা এক সঙ্গে দৌড় লাগালাম। উৎপল সবচেয়ে আগে গিয়ে সেটা ছুঁয়ে ফেললেও আমি বললাম, এই দ্যাখ, তোদের জামা কাপড় ছাড়তে হবে, শুধু আমারই সব শুকনো-আমাকে আগে চড়তে দে। আমার পরেই, উৎপল, তোকে দেবো।

উৎপল আপত্তি করলো না, ওরা বাড়ির ভেতরে চলে গেল, আমি সাইকেলটা নিয়ে প্রথমে বাগানের মধ্যেই কয়েকবার চক্কর দিলাম। আর আপন মনে বারবার বলতে লাগলাম, মানুষ কেন পাগল হয়? কেন পাগল হয়?

কয়েকবার পাক দিয়ে আমার কিছুটা আত্মবিশ্বাস জাগলো। পাড়ার শিবুদার দোকান থেকে পঁচাত্তর পয়সা ঘণ্টা হিসেবে ভাড়া নিয়ে সাইকেল চড়া শিখেছিলাম বছর দু এক আগে। তারপর আর প্র্যাকটিস নেই। সেই জন্য ঠিক ভরসা ছিল না পারবো কি না। কিন্তু বেশ পেরে যাচ্ছি। সেই জন্য ইচ্ছে হলো একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসতে।

ওদের কিছু না জানিয়ে বেরিয়ে গেলাম গেট দিয়ে। বাঁদিকে গেলে মধুপুর শহর ডানদিকে কী আছে জানি না। আমি বেঁকলাম ডানদিকেই। অনেক পরে পরে দুএকটা বাড়ি। সব বাড়িগুলোই ফাঁকা মনে হয়। হয়তো পুজোর সময় এই সব বাড়ি ভর্তি হয়ে যাবে।

রাস্তাটা লাল রঙের। কিছুদূর এগোবার পর আর বাড়ি নেই। রুখু উদলা মাঠ। রাস্তাটা খানিক পরেই ঢালু হতে শুরু করলো। তখনই আমি আবিষ্কার করলাম সেই কদমফুল গাছটা। ফুলে একেবারে ভরে আছে। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, অবাকও লাগে। এতদূরে ফাঁকা মাঠের মধ্যে গাছটা এমন সুন্দর সাজে সেজে আছে কার জন্য? কেউ তো দেখতে আসবে না।

সাইকেল থেকে নেমে আমি গাছটায় চড়তে লাগলাম। ইচ্ছে করলে আমি এই গাছটার সব ফুল পেড়ে ফেলতে পারি। কিন্তু তার দরকার কি, এই গাছটাই তো আমার। আমি ছাড়া তো আর কেউ ওর কাছে থামেনি। একটা ফুলের ওপর হাত রেখে আমি গাছটিকে জিজ্ঞেস করলাম, নিই? একটা নিই এখন?

নরম তুলোর বলের মতন কদমফুল। গালে ছোঁয়ালে ভারী আরাম লাগে। এত সুন্দর একটা জিনিস বিনা পয়সায় পাওয়া যায়। কথাটা ভাবলেই সারা শরীরে একটা ভালো লাগার অনুভূতি হয়। পরক্ষণেই মনে পড়ে, যারা পাগল, তাদেরও কি একটা কদম ফুলের গা দেখলে ভালো লাগে?

রাস্তাটা ঢালু হয়ে গিয়ে একটা নদীতে পড়েছে। নিতান্তই ছোট মেঠো নদী, কারণ এই বর্ষাকালেও তাতে জল বেশী নেই, বড় জোর হাঁটু সমান। স্বচ্ছ জল, তলার বালি

স্পষ্ট দেখা যায়। কাল বিকেলে যে নদীটা দেখেছিলাম, সেটাই ঘুরে এদিকে এসেছে, না এটা অন্য কোনো নদী, তা অবশ্য জানি না।

রাস্তা থেকে বাঁ পাশে খানিকটা দূরে নদীর ধারে একটা বড় পাথর। সেটার ওপর গিয়ে বসলাম। জলে স্রোত আছে, পাথরটার গায়ে ধাক্কা খেয়ে জলটা ঘুরছে সেখানে। কী পরিষ্কার জল, ইচ্ছে করলেই চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলা যায়। এই ছোট্ট নদীটাকে আমার দারুণ পছন্দ হয়ে গেল। আমি সাঁতার জানি না, যাতে আমি জলে ডুবে না যাই সেইজন্য এই নদী বেশী গভীর হয়নি। আমি এটা অনায়াসে পার হতে পারি। পাথর থেকে নেমে পাজামাটা গুটিয়ে আমি চলে গেলাম ওপারে। মাঝখানটায় প্রায় কোমর সমান জল। জীবনে এই প্রথম আমার একটা নদী পার হওয়া। যতই ছোট হোক, নদী তো স্রোত আছে যখন। সেই নাম-না-জানা নদীটার সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল, আমি মাঝে মাঝেই এখানে আসবো।

আশ্চর্য, আমি এতক্ষণ আছি, অথচ এই রাস্তা দিয়ে আর একটাও গাড়ি চলেনি, কোনো মানুষও দেখিনি। কেউ যায় না। অথচ একটা রাস্তা এমনি এমনি হয়েছে। রাস্তাটাও এই নদীতেই শেষ। নদীর অন্য পাড়ে যতদূর দেখা যায় শুধু মাঠ আর দূরে আকাশের গায়ে পাহাড়। কোনো রাস্তাকে এরকম হঠাৎ শেষ হতে আমি দেখেছি কি আগে? কলকাতায় অনেক বন্ধ গলি আছে, সেগুলো কোনো দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খায়। আর এই রাস্তাটা এসে ডুব দিয়েছে নদীতে, আর ওঠেনি। চমৎকার না?

ফেরবার সময়, যে-সব বাড়িগুলোকে জনহীন ভেবেছিলুম, তারই একটা বাড়িতে একজন খুব লম্বা লোককে দেখতে পেলুম। লোকটি একটা লাঠি হাতে একটা কুকুরকে তাড়া করছেন। কুকুরটা কী কারণে যেন লোকটির দিকে ছুটে ঘেউঘেউ করছে। লোকটি মুখে অল্প অল্প দাড়ি, তবু তাঁকে বাঙালী বলেই মনে হয় বাঙালীদের মুখে কী একটা থাকে, দেখলেই ঠিক চেনা যায়। আমি আর সেখানে সাইকেল থামালুম না।

বাড়িতে এসে দেখি, ওপরতলাটা একদম চুপচাপ। ওরা সব গেল কোথায়? আমাকে ফেলেই কোথাও চলে গেল নাকি? ওপরে এসে দেখলাম, ওরা তিনজন খুব মনোযোগ দিয়ে সেই বন্ধ ঘরের তালাটা খোলার চেষ্টা করছে। কোথা থেকে একটা বড় পেরেক যোগাড় করেছে ভাস্কর, সেটা দিয়ে উৎপল নানারকম কায়দা দেখাতে ব্যস্ত। পেরেক দিয়ে তালা খোলা যায়, তা আমি কখনো শুনিনি।

পেছনে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ দেখে আমি বললাম, তালা খোলার সবচেয়ে ভালো উপায় কী জানিস? দড়ির গিট খোলার যা উপায় তাই।

আশু জিজ্ঞেস করলো, কী উপায়?

—আলেকজাণ্ডার পারস্যদেশ জয় করার পর সেখানকার বুড়ো লোকরা একগোছা বিরাট জট পাকানো দড়ি তাঁর সামনে এনে বলেছিল, এই গিট না ছাড়ালে পারস্যের রাজা হওয়া যায় না।

উৎপল বললো, আঃ এখন বকবক করিস না, কন্‌সেনট্রেশন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

আশু বললো, আলেকজাণ্ডার খুলতে পারলেন?

—আলেকজাণ্ডার বললেন, গিট খোলার সবচেয়ে সহজ উপায়টা আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে তিনি তলোয়ারটা বার করে এক কোপে সব দড়িগুলো কেটে ফেললেন। সেই রকম তালা খোলার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো তালাটা ভেঙে ফেলা।

উৎপল ওর রাগী মুখখানা ফিরিয়ে বললো, তুই ভাঙ দেখি তালাটা। দেখি তোর কত ক্ষমতা।

ঠিক জায়গা মতন গল্পটা বলতে পেরে আমার একটু গর্ব হয়েছিল। সুতরাং দমে না গিয়ে বললাম, একটা হাতুড়ি নিয়ে আয়, এক্ষুনি ভেঙে দিচ্ছি।

উৎপল বললো, দ্যাখ!

সে একটা টান মারতেই তালা খুলে গেল, আমরা চমকে উঠলাম।

ভাস্কর উৎপলের কাঁধ চাপড়ে বললো, তুই আর কষ্ট করে লেখাপড়া করছিস কেন? চুরি-ফুরির লাইন যথেষ্ট উন্নতি করতে পারবি।

উৎপল বললো, ওসব কথা পরে হবে, আগে আমার পায়ের ধুলো নে।

সায়েন্টিফিক ব্রেন থাকলে সব কিছুই করা যায়।

ভাস্কর নিচু হয়ে সত্যিই উৎপলকে প্রণাম করলো। উৎপল তাতেও খুব সন্তুষ্ট না হয়ে আমার আর আশুর দিকে তাকিয়ে বললো, তোরাও পায়ের ধুলো নে।

আশু বললো, যাবার দিন তুই যদি তালাটা আবার বন্ধ করতে পারিস সেদিন পায়ের ধুলো নেবো আমি।

দরজা ঠেলে আমরা ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। জিনিসপত্রে একেবারে ঠাসা। অনেক দিন জানলা-টানলা খোলা হয়নি বলে ভেতরে একটা ভ্যাপসা গন্ধ।

সত্যিকথা বলতে কি, তালাটা খুলে ফেলায় আমি একটু নিরাশাই বোধ করলুম। যতক্ষণ ঘরটা বন্ধ ছিল, ততক্ষণ মনে হচ্ছিল ঐ ঘরে যেন কিছু একটা রহস্য আছে। অনেক বন্ধ ঘর দেখলেই এরকম মনে হয়। কিন্তু এ ঘরটাতে কোনো রহস্যই নেই, নিছকই কাজের জিনিসপত্র, থালাবাসন, লেপ, তোশক, দু'খানা ইজিচেয়ার, এইসব। একটু ভালো করে দেখার পর অবশ্য একটা রোমাঞ্চকর জিনিস চোখে পড়লো। ঘরের কোণে ক্যাম্বিসের পোশাক পরানো একটা দো-নলা বন্দুক। তখন বুঝতে পারলুম, এই জিনিসটার জন্যই এ ঘরের চাবি আমাদের দেওয়া হয়নি।

দু'খানা হ্যাজাক তুলে নিয়ে উৎপল বললো, ব্যাস, আলোর প্রবলেম সলভড।

ভাস্কর বন্দুকটা হাতে নিয়ে পোশাক ছাড়িয়ে ফেললো। তারপর পাকা শিকারীর ভঙ্গিতে দু'হাতে সেটা বাগিয়ে ধরে বললো, গুলি টুলিও আছে নিশ্চয়ই।

আশু বললো এই ওটা রেখে দে। বন্দুক নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার দরকার নেই।

ভাস্কর বললো, আমাদের বাড়িতে বন্দুক আছে, আমি বন্দুক চালাতে জানি।

—তবু, রেখে দে!

উৎপল বললো, এই ঘর আমি খুলেছি, এ ঘরের দায়িত্ব আমার। ভাস্কর, বন্দুক নিয়ে ইয়ার্কি আমি পছন্দ করি না।

হ্যাঁ, উৎপল ঠিকই বলেছে, এই ঘরটা এখন থেকে উৎপলের। ভাস্কর খানিকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বন্দুকটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে বললো, যাক, একটা বন্দুক আছে যখন জানা গেল; তখন আর কোন ভয় নেই? ডাকাত-ফাকাত এলে...

তারপরই বিছানার বাণ্ডিল থেকে সে একটা তাকিয়া বার করে নিয়ে বললো, এটাও খুব কাজে লাগবে, একটা কান-বালিশ না থাকলে আমার ঠিক ঘুম হয় না।

প্রায় মুহূর্তের মধ্যেই ভাস্কর বন্দুকের বদরে একটা বালিশ নিয়ে খুশী হয়ে গেল।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেল খুব তাড়াতাড়ি। খাওয়া শেষ হতে না হতেই উৎপল বলে উঠলো, আজ আর কিন্তু ঘুমোনো-টুমোনো চলবে না, বড়মামা তাস খেলার নেমন্তন্ন করেছেন।

অভিজিৎদের বড়মামা এর মধ্যেই আমাদেরও বড় মামা হয়ে গেছেন। ওঁর নামটা তো আমরা জানি না।

পরীকে আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ঐ দিকে যে বাড়িটাতে কালী মন্দির থাকে, সেই বাড়ির বাবুকে তুমি চেনো?

পরী বললো, ডাগদারবাবু বহুত আচ্ছা আদমী।

আমরা বললুম, যিনি কালীপুজো করেন, তিনি ডাক্তারবাবু?

পরী বলল, হাঁ। বহুত আচ্ছা দাওয়াই দেন। পয়সা লেন না!

পরে জেনেছিলুম, অভিজিতের বড়মামা সত্যিই এম বি বি এস পাস অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার। কিছুদিন পাটনা শহরে প্র্যাকটিসও করেছিলেন, পরে সব ছেড়েছুড়ে এখানে কালীপুজো করেন ও গরীব দুঃখী লোকদের ওষুধ দেন।

ও বাড়িতে পৌঁছে আমরা একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলুম। মন্দিরের ঠিক সামনেই কুয়োতলায় অভিজিতের দিকিকে স্নান করানো হচ্ছে। অতবড় একজন মহিলাকে অন্য কেউ চান করিয়ে দেয়, আগে দেখিনি। একজন স্ত্রীলোক ওঁর হাত ধরে আছেন শক্ত করে, আর অভিজিতের মা বালতি করে জল ঢেলে দিচ্ছেন ওঁর মাথায়।

অভিজিতের দিদির ব্যবহারে কিন্তু পাগলামির কোনো লক্ষণই নেই। খুব নরম কাতর গলায় তিনি বলছেন, মা আমায় ছেড়ে দাও না। আমি নিজেই তো চান করতে পারবো!

মা বললেন, আর এই তো হয়ে গেল!

দিদি বললেন, কেন তোমরা আমার ওপর জোর করো, আমি কি নিজে কিছু করি না?

মা বললেন কেন পারবি না! শুধু একটু বুঝে-সুঝে বলতে হবে। তুই কুয়োর মধ্যে নামতে গিয়েছিলি কেন? কুয়োর মধ্যে কেউ নামে? সর্বনাশ হয়ে যেত না একটা?

দিদি যেন খুবই লজ্জা পেয়ে বললেন, আর কোনো দিন নামবো না!

আমরা খুবই অস্বস্তির মধ্যে পড়লুম। একজন যুবতী মহিলাকে স্নান করানোর দৃশ্য বোধহয় আমাদের দেখে ফেলা উচিত না। কিন্তু আমরা তো হঠাৎ এসে পড়েছি। এখন ফিরে যাবো কি?

আমরা চারজন ঘেঁষাঘেঁষি করে আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। অভিজিতের মা আমাদের দেখতে পেয়ে বললেন, খাওয়া হয়ে গেছে? এসো, ভেতরে গিয়ে বসো!

আশু জিজ্ঞেস করলো, অভিজিৎ এখন কেমন আছে?

—ভালো, খেয়ে নিয়ে ঘুমিয়েছে।

এই সময় সঞ্জয় বেরিয়ে আমাদের দেখতে পেয়ে দৌড়ে এলো।

বড়মামা তখন খেতে বসেছেন। এ বাড়িতে দেরি করে খাওয়া দাওয়া হয়, আমরা অসময়ে এসে পড়েছি। আমাদের বসানো হলো ভেতরের একটি ঘরে। সে ঘরটির দেয়ালগুলো জুড়ে বড় বড় র‍্যাক, তাতে নানাকরমের বই ঠাসা। ঘরটিতে চেয়ার টেবিল নেই, একটা লাল রঙের কার্পেট পাতা, তার ওপর ছড়ানো কয়েকটা তাকিয়া। একেবারে যেন তাসের আসর পাতা রয়েছে।

খাওয়া সেরে বড়মামা মস্ত বড় একটা পানের ডিবে হাতে নিয়ে সে ঘরে এসে বসলেন। নিজে এক সঙ্গে দুটি পান মুখে পুরে আমাদের দিকে ডিবেটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, খাও।

আমরা কেউ পান খাই না। তবু যেন শুধু ভদ্রতা রক্ষার জন্যই ভাস্কর এক খিলি পান তুলে নিল। ভাস্কর বনেদী বাড়ির ছেলে, ও এইসব আদবকায়দা জানে। আমরা আর কেউ নিলুম না।

খুব দামী, প্লাস্টিকের দু'প্যাকেট তাস বার করলেন বড়মামা, তারপর খুব কায়দার সঙ্গে শাফল করতে করতে বললেন, কী খেলবে, অকশান? না কনট্রাক্ট?

পাঁচজনের মধ্যে একজনকে বাদ দিতেই হবে। আমার কোনো মতামত না নিয়েই উৎপল বললো, নীলু, তুই তা হলে একটু বোস। আমরা তিনজন খেলি বড়মামার সঙ্গে।

আমাকে ওরা সবচেয়ে কাঁচা খেলোয়াড় মনে করে। তাস খেলা থেকে বাদ পড়ায় আমার খুব আপত্তি ছিল না, কিন্তু খেলার পাশে চুপচাপ বসে থাকা একটা অসহ্য ব্যাপার। তাস খেলা তো আর ফুটবলের মতন নয় যে দর্শকরাই বেশী উত্তেজিত হবে।

খেলার ফাঁকে ফাঁকে টুকরো টুকরো কথায় বড়মামা আমাদের পরিচয় জেনে নিলেন। নিজের সম্পর্কেও বললেন দু'একটা কথা। এখন আর ওঁকে কাপালিকের মতন মনে হয় না। তবে মানুষটি নিশ্চিত খানিকটা অসাধারণ। এমনিতে ডাক্তার, তার ওপর কালীপুজো করেন,ঘরে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসুর বইও রয়েছে। সিগারেট, পান, চা—তিনটেরই খুব নেশা।

কথায় কথায় উনি বললেন, আমার দিদির বড় মেয়েটিকে দেখেছো তো তোমরা? একটু মাথায় দোষ দেখা দিয়েছে। আমার জ্যাঠামশাই পাগল ছিলেন, আমার এক খুড়তুতো ভাইও...আমাদের বংশে একটু পাগলামির ধারা আছে, সেইজন্যেই ও বেচারা.....রাণু পড়াশুনোয় খুব ভালো ছিল, বি এ তে হিস্ট্রি অনার্সে ফার্স্ট হয়েছিল, তারপর থেকেই—

ভাস্কর আমার দিকে আড়চোখে তাকালো, ভাবখানা এই, দেখলি তো আমি আগেই বলেছিলুম কিনা।

বড়মামা আবার বললেন, অনেক রকম চিকিৎসা হয়েছে, ও বেচারীর তো কোনো দোষ নেই, নিজেই বুঝতে পারছে, কোনো চিকিৎসাশাস্ত্র এখনো বংশানুক্রমিক পাগলামি সারাতে পারে না.....এখানে এনে রেখেছি যদি মায়ের দয়াতে কিছু হয়....

আমি জিজ্ঞেস করলুম, সারবে না?

বড়মামা বললেন, মা যদি দয়া করেন, নিশ্চয়ই সারবে। কখনো আশা ছাড়তে নেই। এখানকার কুয়োর জল খুব ভালো...কত লোকের কত রোগ সেরে গেছে। দূর দূর জায়গা থেকে লোকে আমাদের বাড়ির কুয়োর জল নিতে আসে।

একটু বাদে সঞ্জয় এসে আমাকে বললো, নীলুদা, আপনি তো তাস খেলছেন না, আপনি আমার সঙ্গে ক্যারাম খেলবেন?

সেটাই ভালো মনে করে, আমি সঞ্জয়ের সঙ্গে উঠে গেলাম পাশের ঘরে। সেখানে সঞ্জয়ের ছোড়দি ঝুমা খাতা খুলে খুব মন দিয়ে পড়ছে।

ঝুমা আমার দিকে একবার চেয়ে দেখলো, কোনো কথা বললো না। মেয়েটা যেন অহঙ্কারে একেবারে মটমট করছে। ওর কি ধারণা ও আমাদের চেয়ে ইংরিজি বেশী জানে? একবার ভাস্করের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ দিয়ে দেখুক না। আমি যদিও পরীক্ষায় ইংরিজিতে কম নম্বর পেয়েছি, কিন্তু ইংরিজি গল্পের বই আমি নিশ্চয়ই ঢের বেশী পড়েছি ওর থেকে।

আমরা মেঝেতে ক্যারাম বোর্ড পেতে বসতেই ঝুমা তার ছোট ভাইকে ধমক দিয়ে বললো, এই এখানে খেলা চলবে না। দেখছিস না আমি পড়ছি?

সঞ্জয় বললো, আমরা কোথায় খেলবো? এক ঘরে দাদা ঘুমোচ্ছে, দিদির ঘরে মা যেতে বারণ করেছে।

—বারান্দায় যা।

সঞ্জয় একটুক্ষণ তর্ক করে হার মেনে ক্যারাম বোর্ড নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ঝুমা আর একবার অবজ্ঞার দৃষ্টি দিল আমার দিকে। যেন সে বোঝাতে চায়, আমরা এলেবেলে খেলাধুলো নিয়ে সময় নষ্ট করি, কিন্তু সে শুধু পড়াশুনো ভালোবাসে!

সঞ্জয়ের সঙ্গে খেলতে শুরু করেই আমি চমকে উঠলুম। ওরে বাবা, এ যে বিচ্ছু ছেলে একেবারে! সাঙ্ঘাতিক খেলে। একমাত্র উৎপলই এর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে।

সুতরাং মান বাঁচাবার জন্য আমাকে বলতেই হলো, অনেকদিন প্রাকটিস নেই, টিপ নষ্ট হয়ে গেছে, তবে দেখবে, একটা রিবাউণ্ড মার দেখাবো?

কিন্তু আমি যতই রিবাউণ্ড মারের কায়দা দেখাই, তাতে কোনো সুবিধে হলো না, পর পর দুটি গেম সঞ্জয় আমাকে যা-তা ভাবে হারিয়ে দিল। এবং এত সহজভাবে হারাবার ফলেই সে আর খেলায় বেশী উৎসাহ পেল না। আমি দেখলুম, ঘুমে তার চোখ ঢুলে আসছে।

ওকে বললাম, তুমি ঘুমোতে যাও, সঞ্জয়!

আমি আর তাস খেলার জায়গায় ফিরে না গিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। আজও আকাশ মেঘলা করে আছে। বিকেলের দিকে বোধহয় বৃষ্টি নামবে। আকাশের একদিক কালো হয়ে আছে। আমি কালো রং এমনিতে খুব পছন্দ করি না। একমাত্র কালো মেঘই আমার ভালে লাগে। এরইরকম কালো মেঘ আকাশকে কী গম্ভীর করে দেয়! এক এক সময় মেঘ দেখলে মনে হয়, আকাশের গায়ে হেলান দেওয়া হিমালয়কে দেখতে পাচ্ছি।

চাতালে উঠে আমি কালীমূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। মূর্তিটি বেশ বড়, কালো পাথরের। আমার সতেরো বছরের জীবনে ঠাকুর দেবতারা আমাকে ভীষণ ভাবে আলোড়িত করেছে। ভগবান বলে কি সত্যিই কিছু আছে? এই আকাশের নীল যবনিকার আড়ালে থাকেন দেবতারা? যখন আরও ছোট ছিলাম,এই সব বিশ্বাস করতে খুব ভালো লাগতো, রামায়ণ, মহাভারতের গল্প পড়ে মনে হতো, হঠাৎ হয়তো আমিও কোন দেব-দেবীর দেখা পাবো। খুব বৃষ্টির পর আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতাম ব্যগ্রভাবে, আমার আশা ছিল, সব মেঘ সরে গেলে আমি হঠাৎ একদিন এক চিলতে স্বর্গের দৃশ্য দেখতে পাবো।

কিন্তু সতেরো বছরে পৌঁছে, ঐ সব চিন্তাকে ছেলেমানুষি বলে ভাবি। এমন কি কালী ঠাকুরের মূর্তির দিকে সোজাসুজি চাইতে আমার লজ্জা হয়।

ঈশ্বর আছেন কি নেই, এই চিন্তা ছাড়া আর যে দ্বিতীয় চিন্তাটি আমায় বিব্রত করে, তা হচ্ছে নারী সম্বন্ধে। আমার চোদ্দ বছর বয়েস থেকেই আমি দীপান্বিতাকে চিঠি লিখি, সেও আমাকে লেখে। সপ্তাহে অন্তত একবার দীপান্বিতাকে না দেখলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারি না, কেন এই দেখা করবার

ইচ্ছেটা। কেন ব্যাকুলতা। কেন দীপান্বিতার হাতটা ধরলেই আমার বুক কাঁপে? শুধু হাত ধরা কেন, দূর থেকে ওকে দেখলেই আমার বুকের মধ্যে ঢিপ-ঢিপ শব্দ আমি নিজেই শুনতে পাই। কেন, এরকম হয়, প্রেম ভালোবাসার অনেক গল্পের বই আমি পড়েছি, তবু নিজের জীবনে সেটা কিছুতেই পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না। কেন কোনো শাড়ি বা ফ্রকপরা মেয়েদের দেখলেই একটা দুরন্ত কৌতূহল জাগে, ঐ সব পোশাকের মধ্যে ওদের শরীরটা দেখতে কেমন? ছবিতেই তো দেখেছি অনেক, তবু কেন প্রত্যেকের সম্পর্কে আলাদা এই উগ্র কৌতূহল। এমনকি কোনো মহিলার পায়ের গোড়ালি থেকে সামান্য একটু শাড়িটা উঁচু হয়ে গেলে সেদিকে লোভীর মতন চোখ চলে যায়। কেন? অথচ, আবার দৈবাৎ বেশী দেখে ফেললেও দারুণ লজ্জা হয়।

সেই জন্যই মা কালীর দিকে ভালো করে তাকাতে পারি না। মা কালীর শরীরে কোনো পোশাক নেই, তিনি অত্যন্ত বেশী রকমের নারী, তাঁর দিকে তাকালে আমার একই সঙ্গে লজ্জা, শিহরণ, ভয় এবং পাপবোধ জাগে।

আমার পাশে একটা ছায়া পড়লো।

সেদিকে তাকিয়ে আমি সত্যিকারের ভয় পেয়ে গেলাম। অভিজিতের দিদি, সেই রাণুদি কখন নিঃশব্দে এসে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন।

আমি প্রথমেই হাত জোড় করে ফেললাম। যেন, আমি কালীঠাকুরকে প্রণাম করবার জন্যই এখানে দাঁড়িয়েছি। এবং রাণুদিকে বলতে চাইছি, আমায় ক্ষমা করুন, আমায় ছেড়ে দিন, এক্ষুনি চলে যাচ্ছি।

আমার গলা শুকিয়ে গেছে, কোনো কথা বলতে পারছি না। আমার এক ছুটে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া উচিত, অথচ পা দুটো যেন গেঁথে গেছে মাটির সঙ্গে। পাগলদের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করতে হয়, তা আমি কিছু জানি না।

বেশ কিছুক্ষণ রাণুদি সেই রকমভাবে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর বললেন, তোমার নাম কী?

আমি অতিকষ্টে খানিকটা সামলে নিয়ে আমার নামটা বললাম।

উনি বললেন, তোমরাই আজ খোকনকে বাঁচিয়েছো?

এক্ষেত্রে আশুর মতন বিনয় করবার কোনো মানেই হয় না বলে আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম হ্যাঁ।

—বাঃ তোমরা কলকাতায় কোথায় থাকো? কোন কলেজে পড়ো? তোমরা বুঝি বন্ধুরা মিলে প্রায়ই কোথাও বেড়াতে যাও?

আশ্চর্য ব্যাপার, রাণুদির গলার আওয়াজে কিংবা কথায় কোনো রকম পাগলামির ভাব নেই। আমার মাসীরাও এই রকম কথা বলে। রাণুদির কণ্ঠস্বরও খুব মিষ্টি। আর আমার সব মাসীদের চেয়ে অন্য যত মহিলা আগে দেখেছি, তাদের চেয়ে রাণুদি বেশী সুন্দর।

রাণুদি বললেন, কী সুন্দর আজকের দিনটা! মেঘলা মেঘলা, ছায়া ছায়া। এইসব দিনে ইচ্ছে করে না অনেক দূরে বেড়াতে যেতে?

আমি বললুম, হ্যাঁ।

—প্রত্যেকটা দিন প্রত্যেকটা দিনের চেয়ে আলাদা, তাই না।

—হ্যাঁ!

—আমার ইচ্ছে করে একলা একলা কোনো পাহাড়ে উঠতে। একদম ওপরে, আর কেউ থাকবে না, শুধু আকাশ আর আমি.....হবে না! কোনো দিন হবে না! কোনো দিন হবে না! তুমি পাহাড়ে উঠেছো, নীলু?

—হ্যাঁ।

—তোমার বুঝি খুব ভক্তি, তুমি ঠাকুরের সামনে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছো?

—হ্যাঁ।

এমনকি রাণুদি যদি জিজ্ঞেস করতেন, তুমি বুঝি নাকের শিকনি চেটে চেটে খাও? তাহলেও আমি হ্যাঁ বলতুম। রাণুদির কোনো কথার প্রতিবাদ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

রাণুদি একটু কাছে এগিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, একি, তোমার প্যান্টে রক্তের দাগ?

সেই পানের পিকের ছোপ। ভালো করে ওঠে নি। আমি লজ্জায় সেখানটায় হাত চাপা দিলাম।

বাড়ির ভেতর থেকে রাণুদির মা বেরিয়ে এসে রাণুদিকে লক্ষ্য করছিলেন, এবার তিনি ডেকে বললেন, ও রাণু, তুই একটু ঘুমিয়ে নিবি না?

রাণুদি বললেন, হ্যাঁ, মা, যাচ্ছি।

তারপর যেন আমার কাছ থেকে অনুমতি নেবার ভঙ্গিতে রাণুদি বললেন, আমার মা ডাকছেন, আমি যাই?

আমি মাথা হেলালুম।

ঠিক যেন একশো পাঁচ ডিগ্রী জ্বর হঠাৎ ছেড়ে গেল, রাণুদি চলে যাবার পর সেইরকম মনে হলো আমার। অথচ, রাণুদি তো কোনো রকম খারাপ ব্যবহার করেন নি। পাগলামির কোনো চিহ্নই নেই। আমি শুধু রাস্তায় পাগলদের দেখেছি; যারা লাঠি নিয়ে তাড়া করে আসে, কিংবা খুব খারাপ ভাষায় গালাগালি দেয়। রাণুদির এত সুন্দর, এত নরম ব্যবহার, তবু কেন ওঁকে পাগল বলা হচ্ছে।

চাতাল থেকে নেমে আমি কুয়োটার পাশে এসে দাঁড়ালাম। আমাদের বাড়িটার চেয়েও এই কুয়োটা অনেকটা বড়, ওপারে একটা চৌকো কাঠের ঢাকনা, সেটাও আবার তালা দিয়ে আটকানো। শুধু একটা বালতি গলার মতন ফাঁক আছে।

রাণুদি এই কুয়োর মধ্যে নামতে চেয়েছিলেন। সেটাই কি ওঁর পাগলামি? সব কুয়োর মধ্যেই ছোট্ট ছোট্ট লোহার সিঁড়ি থাকে। আমাদের বাড়ির কুয়োটা প্রথম থেকেই আমার মনে হয়েছিল, ঐ সিঁড়িগুলো দিয়ে তলা পর্যন্ত নামলে মন্দ হয় না! শুধু ইচ্ছে হওয়াটাই পাগলামির চিহ্ন? আমার তো কত রকম অদ্ভুত ইচ্ছে হয়! তাহলে, আমিও কি পাগল?

॥৪॥

পরদিন সকালবেলা আর কোনো কথা নয়, আমরা বেরিয়ে পড়লাম পাহাড়ের উদ্দেশ্যে। সঞ্জয় আমাদের সঙ্গে যাবার জন্য আবদার ধরেছিল, কিন্তু অনেক ভেবে-চিন্তেই তাকে আমরা বাদ দিলাম। অভিজিৎ এখনো দুর্বল, তাকে নেওয়া যাবে না, সঞ্জয় গেলে সে দুঃখ পাবে। তা ছাড়া আমরা কখন ফিরবো না ফিরবো, কিছু তো ঠিক নেই।

সঞ্জয়ের বড়মামা অবশ্য আমাদের নিরস্ত করার অনেক চেষ্টা করেছিলেন। উনি বললেন, ওগুলো তো পাহাড় নয়, মাঠের মধ্যে ছোট ছোট টিলা। শুধু শুধু মাঠ ভেঙে অতখানি যাবে কেন? পাহাড় দেখতে চাও, ট্রেনে করে দেওঘর চলে যাও, তারপর টাঙ্গা ভাড়া নিয়ে ত্রিকূট দেখে এসো। কিন্তু টাঙ্গা চড়ে পাহাড় দেখতে যাওয়ার চেয়ে আমার পায়ে হেঁটে একটা পাহাড়কে আবিষ্কার করতে চাই।

বেশ ভোর ভোর আমরা বেরিয়ে পড়লুম, সঙ্গে রইলো কিছু রুটি আর ডিমসেদ্ধ। আশুর ওয়াটার বটল আছে। শুধু বৃষ্টি এলে আমাদের ভিজতে হবে, বেশ তো, ভিজবো!

পাহাড়ের রাস্তা চেনার তো কোনো অসুবিধে নেই। সোজা সামনে তাকিয়ে হাঁটলেই হয়। কিন্তু আমরা যতই সামনের দিকে স্থির লক্ষ্য রেখে যাই, পাহাড়গুলো যেন ডানদিকে সরে যায়।

পাথুরে মাঠ, পাছপালা কম, আমরা পথে দুটো নদী আর দু'তিনটে সাঁওতালদের গ্রাম পেরিয়ে গেলাম। গ্রামের লোকরা আমাদের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে, যেন আমরা ছাড়া আর কোনো প্যান্ট-শার্ট পরা মানুষ এদিকে আগে আসেনি।

আমরা লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, কখনো গাছের ডাল ভেঙে, কখনো পাথরের টুকরো নিয়ে লোফালুপি করতে করতে এগুতে লাগলাম আর মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছে, রুটি আর ডিমসেদ্ধগুলো এবার খেয়ে ফেললেই হয়! কিন্তু উৎপল ওর ঘড়ি দেখে সময়ের হিসেব রাখছে। আগেই ঠিক করা হয়েছে, ন'টার আগে কিছুতেই খাওয়া হবে না। কেন না, তা হলে একটু বাদেই আবার খিদে পেয়ে যাবে।

কালকের দুপুরের সেই কালো মেঘ এখনো থমকে আছে। রাত্তিরে খুব জোর বৃষ্টি হয়ে গেলে আমাদের উপকারে লাগতো তার বদলে, যে কোনো সময় বৃষ্টি হবার সম্ভাবনটা আঁকা রয়েছে আকাশে। ঐ মেঘের জন্যই গুমোট, খুব গরম লাগছে হাঁটবার

সময়। জামাগুলো ঘামে ভিজে যাওয়ার ফলে আমরা সবাই জামা খুলে হাতা দুটো কোমরে জড়িয়ে গিঁট বেঁধে নিলাম। ভাস্কর আড়চোখে দেখে নিল আমার গেঞ্জিটা। ও ভুলে গেছে যে এটা ওরই গেঞ্জি। আশু গেঞ্জি পরে বাধার সম্মুখীন হলাম। একটা বেশ বড় নদী। এ নদী হেঁটে পার হওয়া যাবে না। ঘোলা রঙের জল।

ভাস্কর নেমে গিয়ে নদীর জল ছুঁয়ে দেখে বললো, স্রোত খুব একটা বেশী নেই। সাঁতরে পার হওয়া যাবে।

আশু বললো, জামা প্যান্ট সব ভিজিয়ে?

ভাস্কর বললো, তাতে কী হয়েছে? একটু বাদেই শুকিয়ে যাবে আপনা আপনি। এত দূর এসে তো আর ফেরা যায় না!

উৎপল বললো, তোরা সবাই জামা প্যান্ট খুলে একটা পুঁটলি বেঁধে ফ্যাল, আমি সেই পুঁটলিটা এক হাতে উঁচু করে নিয়ে আর এক হাতে সাঁতরে চলে যাবো। এ আর কতখানি!

উৎপল সেটা পারলেও পারতে পারে ভেবে আশু আর ভাস্কর কোনো আপত্তি করলো না। তাছাড়া, উৎপল যদি কোনোক্রমে পুঁটলিটা ভিজিয়ে ফ্যালে, তাহলে সেই উপলক্ষে অনেকক্ষণ ওর পেছনে লাগা যাবে। ভাস্কর প্যান্টের বোতাম খুলতে শুরু করলো।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এখানে কোনো কথা বলার অধিকার নেই।

আশু আমার দিকে চেয়ে বললো, কিন্তু নীলু? ও কী করে পার হবে?

ভাস্কর বললো, তাই তো, নীলুটা যে আবার সাঁতার জানে না? এই জন্য তোদের বাইরে কোথাও নিয়ে যাই না। সাঁতারটা শিখে রাখতে পারিস নি? তোকে কতবার বলেছি, হেদোয় ভর্তি হ!

আমি অভিমানের সঙ্গে বললাম, তোরা যা। আমি এখানেই বসে থাকবো।

উৎপল একটু চিন্তা করে বললো, দু'জনের মিলে নীলুকে ধরে ধরে নিয়ে যাওয়া যায় না?

আশু বললো, সেটা রিস্কি। যে একদম সাঁতার জানে না..... হঠাৎ ভয় পেয়ে জড়িয়ে ধরলে।

সেরকমভাবে আমি যেতেও চাই না! আমি দৃঢ়ভাবে বললাম, বলছি তো, তোরা যা, আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না।

আশু সঙ্গে সঙ্গে বললো, ঠিক আছে, আমি নীলুর সঙ্গে এখানে থাকছি। তোরা দু'জন ঘুরে আয়। পাহাড় তো এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে।

এরকম সময় কারুর সমবেদনাতেও সান্ত্বনা পাওয়া যায় না। আমি আশুকে এক ধমক দিয়ে বললাম, তোকেও থাকতে হবে না, আমি একাই থাকতে পারবো।

ভাস্কর বললো, 'হু'! তাহলে ব্যাপারটা ভালো করে চিন্তা করা যাক। কিন্তু তার আগে রুটি আর ডিম-ফিমগুলো খেয়ে ফেললে হয় না?

উৎপল ঘড়ি দেখে বললো, ন'টা বাজতে এখনো চল্লিশ মিনিট বাকি। তোরা নিজেরাই ঠিক করেছিলি....

আশু বললো, তা বলে তো আর ওগুলো জলে ভেজাবার কোনো মানে হয় না। যদি আমরা সাঁতরেই যাই।

একটা বড় শাল গাছের তলায় বসা হলো। জায়গাটা বেশ পরিষ্কার। পিকনিক করতে হলে এরকম জায়গাতেই আসা উচিত। আমার অভিমান এমনই তীব্র হলো যে খিদেটাও যেন চলে গেল। আমি বললাম, আমি খাবো না, তোরা খেয়ে নে।

উৎপল বললো, খা, খা, আর ন্যাকামি করতে হবে না। তুই কাল সকাল থেকে আমার কাছে সাঁতার শিখবি।

আটখানা ডিম ও বারোখানা রুটি প্রায় চোখের নিমেষেই শেষ হয়ে গেল। আশুর ওয়াটার-বটল থেকে সবাই এক ঢোক করে জল খেয়ে নেবার পর ভাস্কর বললো, এবার কী করা যাবে!

আমার চোখ তখন নদীর ওপারে।

সাঁতার না জানারও যে একটা উপকারিতা আছে, সেটা সেদিন টের পেলাম। সাঁতার জানতুম না বলেই সেদিন একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা হলো।

ওপারে দেখা গেল আট দশটা মোষ আর কয়েকটা সাঁওতাল ছেলে। তারা নদীর পারে এসে এক মুহূর্তও দেরি করলো না। মোষসমেত হুড়মুড়িয়ে জলে নেমে পড়লো। মোষগুলো জন্ম থেকেই সাঁতার জানে। সেই মোষের পিঠে চেপে সাঁওতাল ছেলেগুলোও দিব্যি চলে এলো এপারে।

আমি উঠে গিয়ে একটি সাঁওতাল ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম, এই ভাইয়া, ইধার নদী পার হোনে কা কই ব্রীজ হ্যা? সেতু?

সে কী বুঝলো কে জানে। সে বললো, নেহি হ্যায়।

আমি আবার বলবার তোমার একঠো মোষের মানে ভাঁইস কা পিঠি মে হামকো পার কর দেগা।

সে কোনো উত্তর দিল না।

আমি আবার বললাম,আট আনা পয়সা দেগা।

সে কোনো উত্তর দিল না।

আমি আবার বললাম, আট আনা পয়সা দেগা।

ছেলেগুলো খুব হাসতে লাগলো। আমি সে হাসি গ্রাহ্য না করে একটা বেশ জোয়ান চেহারার লোকের পাশে দাঁড়িয়ে বললাম, গুঁতায় গা নেহি তো?

কাছের ছেলেটি বললো, নেহি। আপ উঠিয়ে গা।

সেই আমাকে সাহায্য করে মোষটার পিঠে চাপিয়ে দিল।

মোষটা দিব্যি শান্ত, কোনো আপত্তিই করলো না।

আমি সগর্বে বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বললাম, দেখলি? আমি নিজেই নিজের ব্যবস্থা করতে পারি কিনা?

ওরা তিনজেনই চুপ।

আমি আবার বললাম, ইচ্ছে করলে তোরাও মোষের পিঠে আসতে পারিস।

উৎপল বললো, ফালতু আট আনা পয়সা খরচা করতে যাবো কেন।

ওদের প্যান্ট শার্টের পুঁটলিটা আমার হাতে দিয়ে ওরাও নেমে পড়লো জলে। আমি নিজের প্যান্ট না খুলেই মোষের পিঠে চড়ে বসেছি। আর নামার কোনো মানে হয় না।

বেশী কায়দা দেখাবার জন্য, মোষটা জলে নামতেই আমি আস্তে আস্তে বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ালাম। শুধু আমার প্যান্টটাই বা ভেজানো কেন?খুব ব্যালেন্স করে থাকতে হবে।

সাঁতার কেটে আবার মোষটা খুব কাছে চলে এসে ভাস্কর একবার মুখটা তুলে দারুণ ধমক দিয়ে বললো, এই, বোস। বেশী ইয়ার্কি না? একবার পড়ে গেলে আর খুঁকে পাওয়া যাবে না।

নির্বিঘ্নে এপারে এসে পৌছালাম। মোষের সঙ্গী সাঁওতাল ছেলেটি মোষের ল্যাজ ধরেই চলে এসেছে। আমি তাকে একটা আধুলি দিতেই সে সেটা একটা কানের মধ্যে ফিট করে ফেললো আবার মোষটাকে নিয়ে নেমে পড়লো জলে। পয়সা সম্পর্কে যেন ওর কেনো লোভ নেই।

কিছুক্ষণ আগেকার অভিমানটা কেটে গিয়ে আমি বেশ একটা জয়ের আবেগে উৎফুল্ল। বন্ধুদের কাছ থেকে আমি কখনো দয়া নিতে চাই না।

ভাস্কর এপারে উঠে বললো, আগে জানলে তোয়ালে নিয়ে আসতাম। মাথাটা ভিজে থাকবে।

আমি বললাম, মনে কর না বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি পড়লে তো ভিজতেই হতো।

উৎপল বললো, নীলুকে দেখছি পাহাড়েই রেখে আসতে হবে। কেন না, ফেরার সময় তো আর ওর জন্য মোষ রেডি থাকবে না?

আমি বললাম, আমি গ্ল্যাডলি পাহাড়ে থেকে যেতে রাজি আছি।

সেখান থেকে পাহাড় আর বেশী দূর নয়।মরা পৌনে এক ঘণ্টার মধ্যেই পৌছে গেলাম।

দূর থেকে একটা পাহাড় মনে হলেও আসলে রয়েছে পর পর ককেটা। মাঠের মধ্যে দুম করে এই পাহারগুলো উঠেছে। খুব বেশী বড় নয়, বেশ ছোটখাটো, ছিম-ছাম, এখানেও গাছপালা বেশী নেই।

আমি বিস্মিতভাবে বললাম, দেখেছিস একটা জিনিস? ঠিক পাশাপাশি চারটে পাহাড় রয়েছে।

আশু বললো, ঠিক।

আমি বললাম, তাহলে আমরা প্রত্যেকেই একটা করে পাহাড় নিয়ে নিতে পারি। কোনো ঝগড়া হবে না। কে কোনটা নিবি বল?

ভাস্কর উদারভাবে বললো, তুই আগে বেছে নে।

একেবারে ডানদিকের পাহাড়টা আমার প্রথম দেখেই পছন্দ হয়েছিল। বেশ গোল ধরনের, মাথার ওপরে একটা একলা গাছ।

আমি বললাম, আমি ভাই ঐ পাহাড়টা নিচ্ছি। আমার পাহাড়ে আমি একলাই যাচ্ছি, তোরা কেউ আসিস না।

দৌড়ে চলে গেলাম সেদিকে। আমি একটা পাহাড় জয় করতে যাচ্ছি। আমার নিজস্ব পাহাড়। শরীরে দারুণ উত্তেজনা।

ভেবেছিলাম এক দৌড়েই উঠে যেতে পারবো। কিন্তু যত ছোট মনে হয়, তত ছোট নয় পাহাড়টা, আস্তে আস্তেই ওঠা উচিত ছিল। দৌড়াবার জন্য হাঁপিয়ে গেলাম, একেবারে চূড়ায় উঠে নাম-নাজানা গাছটাকে ধরে দম নিতে লাগলাম। গরমের চোখে শরীরের প্রতিটি রন্ধ্র যেন জ্বালা করছে।

খানিকক্ষণ দাঁড়াবার পর বাতাসে শরীর জুড়োলো। নিচের গাছপালাগুলো খুব ছোট ছোট দেখাচ্ছে, দূরে সেই নদী। একটা সাদা ফিতের মতন। আমার জীবনের প্রথম পাহাড় চূড়া। আমি সত্যি সত্যি উঠেছি। স্বপ্ন নয়। আমি ভাস্কারদের মতন দার্জিলিং এ যাই নি, দার্জিলিং-এর মতন উঁচু না হোক, তবু এই পাহাড়ই আমার প্রিয়।

হঠাৎ মনে পড়লো রাণুদির কথা। উনি একলা একটা পাহাড়ে উঠতে চান। বলেছিলেন, কখনো হবে না। কেন হবে না? রাণুদিকে এখানে নিয়ে আসা যায় না? আমি সঞ্জয়ের বড়মামাকে আজই বলবো। রাণুদি চান পাহাড়ের ওপর একলা দাঁড়াতে, যেখানে আকাশ ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। এই রকম একটা পাহাড়ের ওপর দাঁড়ালে, রাণুদির মনের অসুখ সেরে যেতে পারে।

রাণুদির জন্য আমার দারুণ ব্যাকুলতা বোধ হলো। তক্ষনি খুব ইচ্ছে হলো রাণুদিকে দেখতে। দীপান্বিতাকে দেখার ইচ্ছে যেমন হয়, কিংবা তার চেয়েও বেশীক্ষণ আমার এরকম হচ্ছে। রাণুদি আমার চেয়ে বয়েসে কত বড়। রাণু মাসীকে দেখার জন্য তো এমন তীব্র ইচ্ছে হয় না। রাণুদিকে না দেখলে আমিই বুঝি পাগল হয়ে যাবো!

আ-আ-ও-ও-ও, টার্জানের মতন এই রকম আওয়াজ শুনে আমি পেছনে ফিরে তাকালাম।

আমার ঠিক পাশের পাহাড়টার চূড়ায় উঠে ভাস্কর ঐ রকম ডাক ছাড়ছে আর নিজের জামাটা পতাকার মতন ওড়াচ্ছে। অন্য দুটো পাহাড়ের ওপরেও আশু আর উৎপল উঠে এসেছে। আমরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগলাম পরস্পরকে জানান দেবার জন্য।

আমরা চারজন যেন এই পৃথিবীর রাজা। আমাদের মাথায় আকাশের মুকুট, আর পায়ের তলা পড়ে আছে পৃথিবী।

অন্য চিৎকার বন্ধ করে ভাস্কর বলতে লাগলো, ধোঁয়া! ধোঁয়া!

আমি বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করতে লাগলাম, কী, কী?

ভাস্কর একদিকে হাত দেখিয়ে ইঙ্গিত করছিল। সেদিকে তাকিয়ে দেখলাম, দুটো পাহাড়ের মাঝখানের জায়গাটায় খানিকটা ঝোপ মতন, সেখান থেকে সত্যিই ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

সুতরাং আর একটা আবিষ্কারের জিনিস পাওয়া গেল। আমি আর ভাস্কর হু-হু করে নামতে লাগলাম নিচের দিকে। আশু আর উৎপলকে ইঙ্গিত করলাম ঐ দিকে আসতে।

নিচে নামবার সময় কোনো পরিশ্রম হয় না। কিন্তু বেশী তাড়াতাড়ি করতে গিয়েই আমি আছাড় খেলাম বেশ জোরে। আর একটু হলে গড়িয়ে অনেক নিচে পড়তাম, তাহলে আর আমার একটা হাড়ও আস্ত থাকতো না। সামলে নিলাম কোনোক্রমে। বাঁ পায়ের হাঁটুর কাছটায় চোট লেগে, প্যান্টটা ছিঁড়ে পা কেটে রক্ত বেরিয়ে গেল। পা কাটে

কাটু, কিন্তু প্যান্টটা ছিঁড়ে গেল বলে যেন আমার বুক ফেটে যাবার উপক্রম হলো। নাঃ, ফুল প্যান্ট পরা আমার ভাগ্যে নেই।

ইস, আমি কী বোকা। পাহাড়ে চড়বার জন্য তো হাফ প্যান্টই ভালো, আমি কেন হাফ প্যান্টটা আজ পরে আসিনি। জানবোই বা কী করে, আগে তো কখনো পাহাড়ে চড়িনি।

ভাস্কর আমার থেকে অনেক আগেই পৌঁছে গেছে। একটুক্ষণের মধ্যেই আশু আর উৎপলও এসে গেল।

নিচের সমতল জায়গাটায় ঝোপের মধ্যে একটা ছোট বাঁশের ঘর। দেখেই মনে হয়, নতুন তৈরি করা হয়েছে। ধোঁয়া বেরুচ্ছে ঘরটা সামনে থেকেই।

পাথর-টাথর সাজিয়ে সেখানে একটা চুল্লি বানানো হয়েছে, তার ওপরে একটা মাটির হাঁড়ি বসানো। গন্ধতেই বোঝা যায়, ভাত ফুটছে। গেরুয়া পোশাক পরা মুখ ভর্তি দাড়ি গোঁফওয়ালা একজন লোক সেখানে বসে। আর ঘরের দরজার পাশে প্যান্ট শার্ট পরে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে পকেটে হাত দিয়ে। দু'জনেই খানিকটা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।

প্যান্ট-শার্ট পরা লোকটিকে আমি চিনতে পারলাম। সেদিন সাইকেল নিয়ে বেড়াতে গিয়ে একে আমি দেখেছিলাম একটা বাড়িতে। একটা লাঠি নিয়ে কুকুর তাড়াচ্ছিল।

আমরা চারজন চারদিক থেকে নেমে এসে পাশাপাশি দাঁড়ালাম।

গেরুয়া পরা লোকটি বললো, লেড়কা লোগ ঘুমনে আয়া।

প্যান্ট-শার্ট পরা লোকটি হেসে আমাদের জিজ্ঞেস করলো, তোমরা এখানে অ্যাডভেঞ্চার করতে এসেছো বুঝি? তোমরা তো মুঘুরে শিব-নিবাস বাড়িটায় উঠেছো, তাই না?

ভাস্কর দলনেতা হিসেবে উত্তর দিল, হ্যাঁ।

লোকটি বললো, আমিও তোমাদের কাছাকাছিই আছি। এই সাধুজী, আত্মারামজী এখানে থাকেন, আমি মাঝে মাঝে এখানে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে আসি।

সাধুজী বললেন, বৈঠো, তুমলোগ বৈঠো। পানি গিওগে? ইধার এক ঝর্ণা হ্যায়, পানি বহুৎ আচ্ছা, একদম মিঠা—

আশু গিয়ে ঝপ করে সাধুবাবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ফেললো। অগত্যা আর উপায় কী, আমরাও প্রণাম করলাম। উনি বিড়বিড় করে কী যেন আশীর্বাদ করলেন আমাদের মাথা ছুঁয়ে।

হাঁড়িতে ভাত ফুটে ঢাকনাটা লাফাচ্ছে। সেই গন্ধে বেশ চনমনে খিদে পেয়ে গেল। আমরা কখন ফিরবো কোনো ঠিক নেই, সারাদিন আর খাওয়া জুটবে না। কেন যে আরও বেশী করে খাবার আনিনি।

পেতলের চকচকে ঘটিতে সাধুজী জল এনে দিলেন, সেই জলই খেয়ে নিলাম পেট ভারে। প্যান্ট-শার্ট পরা লোকটি জিজ্ঞেস করলো, আমরা কোন দিকে দিয়ে এসেছি। ভাস্কর সবিস্তারে কাহিনীটি বললো। আমি মোষের পিঠে চড়ে নদী পার হয়েছি শুনে সে হো-হো করে হেসে উঠলো, সাধুজীর ঠোঁটেও মুচকি হাসি দেখা দিল।

প্যান্ট-শার্ট পরা লোকটি জানালো যে আমরা অনেক ঘুর পথে এসেছি। আমাদের লেগেছে সাড়ে তিন ঘণ্টা, কিন্তু মধুপুর থেকে মাত্র দু'ঘণ্টাতেই এখানে পৌঁছোনো যায়, গ্রামগুলোর মধ্য দিয়ে সংক্ষিপ্ত পথ আছে আর ঐ নদীটার ওপরে সাঁকোও আছে এক জায়গায়।

আমরা পাহাড়কে চোখের সামনে রেখে সোজা এগিয়ে এসেছি, তবু সেটাও ঘুর পথ হলো? আশ্চর্য ব্যাপার!

উৎপল বললো, আমরা এবার যাই। আপনি আমাদের সেই শর্টকাটের রাস্তাটা একটু দেখিয়ে দেবেন?

প্যান্ট-শার্ট পরা লোকটির নাম অজিত রায়। আমরা তাঁকে অজিতদা বলে ডাকতে লাগলুম। তিনি সাধুজীকে বললেন, বাবা আপ ভোজন কর লিজিয়ে। ম্যায় আভি আ রাহা হুঁ।

তারপর তিনি এলেন আমাদের একটু এগিয়ে দিতে। আমি বললাম, কিন্তু ঝর্ণাটা আমরা একবার দেখবো না? ঝর্না না দেখেই ফিরে যাবো?

অজিতদা বললেন, এ ঝর্ণাটা দেখবার মতন কিছু না। তোমরা গিরিডি গেছো? সেখানে সুন্দর একটা জলপ্রপাত আছে। উশ্রী ফল্‌স। খুব বিখ্যাত। দেখোনি? তাহলে কালই চলে যাও!

আমি বললাম, তবু এই ঝর্ণাটা আমি একবার দেখবোই!

অজিতদা এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে ডান হাত তুলে বললেন, ফেরার সময় তোমরা এদিক দিয়ে গেলেই রাস্তা পেয়ে যাবে। আর ঝর্ণাটা এই দু'নম্বর পাহাড়টার পেছনে। আমি ভাই সাধুবাবার কাছে যাচ্ছি। ওনাকে ক'দিন ধরে খুব জপাচ্ছি। এই সাধু একটা দারুণ জিনিস জানেন। অ্যালকেমি কাকে বলে জানো? সোনা তৈরি করা ফর্মূলা। কিছু কিছু সাধু এখনো সেই বিদ্যে জানে না। সেই জন্যই তো আমি প্রায়ই এসে এনার পায়ের কাছে পড়ে থাকি।

ভাস্কর জিজ্ঞেস করলো, সত্যিই সোনা তৈরি করতে জানেন? আপনি প্রমাণ পেয়েছেন?

অজিতদা বললেন, হুঁ, একদিন আমার চোখের সামনে এক টুকরো তৈরি করে দেখিয়েছেন। কিন্তু কিছুতেই কায়দাটা শেখাচ্ছেন না আমাকে। বলছেন, ওতে নাকি মানুষের লোভ বেড়ে যায়। আচ্ছা, চলি ভাই!

আমরা ঝর্ণার দিকে খানিকটা এগোবার পর উৎপল বললো, আমাদের ছেলেমানুষ ভেবে খুব গুল ঝেড়ে গেল লোকটা। সোনা আবার কেউ তৈরি করতে পারে নাকি?

আশু বললো, পারতেও তো পারে। খাঁটি সাধু সন্ন্যাসীদের তো অনেক অলৌকিক ক্ষমতা থাকে।

উৎপল বললো, ওসব সাধুদের স্রেফ ম্যাজিক।

ভাস্কর বললো, আমরাও এই সাধুর কাছে একটু ম্যাজিক দেখলে পারতাম!

ঝর্ণা খুঁজে পেতে অনেক সময় লাগলো। একটা খুব সরু জলের ধারা, তবে জলটা বেরুচ্ছে মাটি ফুঁড়ে। মাটির নিচে জল আছে, আমরা সবাই সে কথা জানি, টিউবওয়েল পুঁতলেই তো জল বেরোয় তবু, মাটি ভেদ করে জল উঠতে দেখলে অবাক লাগে। আপন মনে, অবিরাম জল বেরিয়েই আসছে। কোনোদিন কি এ জল ফুরোয় না?

সবারই খিদে পেয়ে গ্যাছে, কেউ আর বেশীক্ষণ থাকতে চায় না। ভাস্কর বললো, শুধু শুধু এই একটা ছোট্ট ঝর্ণা দেখার জন্য আরও অনেক দেরি হয়ে গেল। এই নীলুটার জন্যই তো! ঝর্ণা দেখবো, ঝর্ণা দেখবো! কী দেখলি? এটা না দেখলে কী ক্ষতি হতো?

একটা ঝর্ণা না দেখলে কী ক্ষতি হয়? কিছুই না। শুধু, একটা ঝর্ণা না দেখলে সেই ঝর্ণাটা না-দেখা থেকে যায়।

ভাস্কর 'ইয়ারো ভিজিটেড' কবিতাটা আবৃত্তি করতে লাগলো। কবিতাটা আমাদের কলেজের পাঠ্য। ইয়ারো নামে একটা ঝর্ণা ছিল, কবি বলেছেন, সেটা দেখার চেয়ে না দেখাই ভালো ছিল।

কিন্তু এ পৃথিবীর সব ঝর্ণা আমার দেখতে ইচ্ছে করে।

॥৫॥

দেওঘর বেড়াতে গিয়ে ফিরতে ফিরতে আমাদের অনেক রাত হয়ে গেল। মধুপুর স্টেশনে এসেই নামলা রাত ন'টায়। মাত্র একটাই টাঙ্গা, যেন ঠিক আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিল। আমরা ভেতরে বসলাম,উৎপল টাঙ্গাওয়ালার পাশে বসে গান গাইতে লাগলো। তারপর আমরাও যোগ দিলাম সেই গানে।

আমাদের বাড়ির কাছাকাছি এসে রাস্তার ওপরে বেশ কিছু লোকের গলার আওয়াজ পেলাম। তারপর গেলাম সঞ্জয়ের বড় মামাকে। তিনি জামা গায়ে দিয়েছেন। আমাদের দেখে তিনি বললেন, টাঙ্গাটা পাওয়া গেছে, ভালো হয়েছে। এটা নিয়েই তা হলে আমি থানায় যাই।

উৎপল জিজ্ঞেস করলো, থানায় কেন?

বড়মামা বললেন, সন্ধে থেকে রাণুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

আমরা টাঙ্গা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লাম।

এই তিন চারদিনে রাণুদির সঙ্গে আমাদের বেশ ভাব হয়ে গেছে। তাঁর ব্যবহারে আমরা পাগলামির সামান্যতম চিহ্নও খুঁজে পাই নি। মাঝে মাঝে তিনি শুধু চুপ করে বসে থাকেন। তখন কারুর সঙ্গে কথা বলেন না। অন্য সময় একদম স্বাভাবিক।

এদিক সেদিকে যে-কয়েকটা বাড়ি ছড়িয়ে আছে, সেই সব বাড়ির মালি ও চৌকিদাররা বেরিয়ে এসেছে। সব জায়গায় খুঁজে দেখা হয়েছে এর মধ্যে, রাণুদি কোথাও নেই।

আমার প্রথমেই মনে পড়লো আমাদের বাড়ির পুকুরটার কথা। তা ছাড়া রাণুদি একদিন কুয়োর মধ্যে নামতে চেয়েছিলেন।

বড়মামা বললেন, না, ও জলে ডুবে যাবে না। রাণু সাঁতার জানে। তা ছাড়া সব কটা বাড়ির কুয়োও দেখা হয়েছে।

টাঙ্গা নিয়ে বড়মামা চলে গেলেন থানায়। যাবার সময় বিড় বিড় করে বলে গেলেন, থানায় গিয়ে কী লাভ হবে কে জানে! তবু দিদি বলছে বারবার।

আমরা প্রথমেই সঞ্জয়কে ধরে পুরো ব্যাপারটা জেনে নিলাম।

আমরা সকালবেলা দেওঘর যাবার সময়ও দেখেছিলাম রাণুদিকে। উনি খুব ভোরে উঠে পুজোর জন্য ফুল তোলেন, আমাদের দেখে হাসিমুখে হাত নেড়েছিলেন দূর থেকে।

সঞ্জয় বললো, দুপুর থেকেই দিদির মেজাজ খারাপ হয়েছিল। একটাও কথা বলছিল না কারুর সঙ্গে। মা কতবার ডাকলেন, কতবার বিকেলের চা খাবার জন্য সাধাসাধি করলেন, দিদি একবারও মুখ ফেরায়নি পর্যন্ত। দুপুর থেকে ঠিক এক জায়গায় বসে ছিল অন্তত চার পাঁচ ঘণ্টা--

এরকম আমরা দেখেছি। এক জায়গায় ঠায় চার পাঁচ ঘণ্টা একটু না নড়াচড়া করে বসে থাকতে যে কেউ পারে, তা রাণুদিকে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। অথচ অত সময় রাণুদি বেশ ছোটাছুটিও করতে পারেন। এই তো কাল সকালেই রাণুদি আমাদের সঙ্গে ব্যাডমিণ্টন খেললেন।

সঞ্জয় বললো, ঐ রকমভাবে দিদি মাঝে মাঝেই বসে থাকে বলে মা আর ডাকেন নি। হঠাৎ সন্ধের পর দেখলাম, দিদি নেই! তারপর থেকেই তো সবাই মিলে খুঁজছি—

আমরা পাহাড় দেখে এসে খুব গল্প করেছিলাম। রাণুদি তাই শুনে বলেছিলেন, ইস, তোমরা আমায় নিয়ে গেলে না? আমার খুব ইচ্ছে করে যেতে। আমায় কেউ কোথাও বেড়াতে নিয়ে যায় না, আমি পাগল না! আমরা তক্ষুনি বলেছিলাম, আর একদিন আমরা রাণুদি আর সঞ্জয়দের সবাইকে নিয়ে ঐ পাহাড়ের ধারে পিকনিক করতে যাবো।

রাণুদি এই অন্ধকারে একা একাই সেই পাহাড়ের দিকে চলে যান নি তো? অথবা প্রথম দিন যে দেখেছিলাম, দুপুরবেলা রাণুদি মাঠের মধ্যে একটা গাছে হেলান দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন, সেই রকম এই অন্ধকারে মাঠের মধ্যে যদি কোথাও বসে থাকেন, তা হলে খুঁজে পাওয়া খুবই শক্ত।

কিন্তু রাণুদিকে পেতেই হবে। আমরা চারজন চারদিকে ছড়িয়ে পড়লাম।

আমার টর্চ নেই, শুধু চোখ দিয়েই যেন অন্ধকার ফুঁড়তে লাগলাম। অবশ্য খুব বেশী অন্ধকার ছিল না, পাতলা পাতলা জ্যোৎস্না ছিল আকাশে। সেই আলোতে অসুবিধেও হয় অনেক, ছোট ছোট গাছ বা পাথরের স্তূপকেও মানুষ বলে মনে হয়। সত্যি কথা বলতে কি, আমার একটু ভয় ভয় করছিল। রাত্তিরবেলা একলা একলা মাঠের মধ্যে ঘোরা তো আমার অভ্যেস নেই। হঠাৎ এক একটা গাছ দেখে সন্দেহ হয়, এই গাছটা কি দিনের বেলা ছিল এখানে? অথবা অধিকাংশ গাছকে ঘোমটা পরা বউ বলে মনে হয় কেন? এক এক সময় সত্যিই তাই মনে হয়। আমি থমকে গিয়ে ফিসফিস করে ডাকি, রাণুদি! রানুদি!

কেউ কোনো উত্তর দেয় না।

পরীক্ষার সময় যেমন ভগবানকে ডাকতে হয়, ঠিক সেই রকমই ব্যাকুলভাবে আমি মনে মনে বলতে লাগলাম, হে ভগবান, রাণুদিকে যেন আমি খুঁজে পাই। অন্য কেউ না আমিই আগে রাণুদিকে দেখবো।

ছুটতে ছুটতে কত দূর গিয়েছিলাম জানি না। এক সময় মনে হলো, এবার আমিই বুঝি রাস্তা হারিয়ে ফেলবো।

আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো না, অন্যরাই আগে রাণুদিকে খুঁজে পেল। এক সঙ্গে অনেকগুলো গলার আওয়াজ শুনলাম, পাওয়া গেছে। এই তো রাণুদি। তারপরেই কয়েকটা জোরালো চর্টের আলো। আমিও দৌড়ে গেলাম সেদিকে।

রাস্তাটা যেখানে ছোট নদীটায় মিশে শেষ হয়ে গেছে, তার পাশে যে বড় পাথরটায় আমি একদিন এসে বসেছিলাম, ঠিক সেখানেই বসে আছেন রাণুদি। তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে সঞ্জয়, ঝুমা, আশু, উৎপল আর সতীশ নামে বড়মামার এক কর্মচারী। এদের সকলের মাথা ছাড়িয়েও দেখা যায় অজিতদাকে। তিনিই এখানে রাণুদিকে প্রথম দেখতে পেয়ে সঞ্জয়দের খবর দিয়েছেন। কাছেই অজিতদাদের বাড়ি।

অজিতদা একা এত রাত্তিরে একটি মেয়েকে ওখানে বসে থাকতে দেখে অনেকবার ডাকাডাকি করেছিলেন, রাণুদি কোনো উত্তর দেননি।

সঞ্জয় বললো, এই দিদি, ওঠো! এখানে বসে আছো যে? মা চিন্তা করছেন।

রাণুদির যেন শ্রবণশক্তি নেই। দেহে প্রাণ আছে কি না তাতেই সন্দেহ জাগে, এমন স্তব্ধ নিশ্চল মূর্তি।

আমরা সবাই মিলে ডাকতে লাগলাম, সঞ্জয় ওঁর হাত ধরে টানতে লাগলো তবু কোনো হুঁশ নেই।

এই সময় অভিজিতের সঙ্গে রাণুদির মা-ও এসে পড়লেন। তিনি দৌড়ে গিয়ে রাণুদিকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ও রাণু, রাণু! এ কী করছিস মা? এমনভাবে আমাদের চিন্তায় ফেরতে আছে?

রাণুদি এবার মুখ ফিরিয়ে খুব শান্তভাবে বললো, মা চুপ করো। ঐ দ্যাখো, ভগবান!

রাণুদি আঙুল দিয়ে একটা বুনো গাছ দেখালেন।

অমনি তিনচারটি টর্চের আলো পড়লো সেই গাছটার ওপরে। কী আর দেখা যাবে, মাঠে কিংবা নদীর ধারে সাধারণ গাছ যেমন থাকে, সেই রকম একটা।

রাণুদির মা বললেন, তুই এখানে বসে আছিস কেন? চল, বাড়ি চল।

রাণুদি ঠিক সেই একই গলায় বললেন, ভগবান আমাকে ডেকে এনেছেন। তোমরা দেখতে পাচ্ছো না?

বড়মামার সাগরেদ শতীশবাবু বললেন, রাণুদিদি তো ঠিকই বলছে। সব কিছুর মধ্যেই ভগবান আছেন। যে-কোনো জীব, এমন কি গাছপালার মধ্যেও।

রাণুদি বললেন, ভঘবান আমার দিকে চেয়ে আছেন।

মা বললেন, ইস, মাথার চুল সব ভিজে! আজ তো বৃষ্টি হয়নি, তুই কোথাও চান করেছিস নাকি?

রাণুদি বললেন মা, তোমরা এত কথা বলছো কেন? ভগবান আমায় ডাকছেন, শুনতে পাচ্ছো না?

রাণুদির মা কেঁদে ফেললেন। সতীশবাবু বললেন, রাণুদিদি, ভগবান তো সব জায়গায় দেখতে পান। বাড়িতে গেলেও ভগবান তোমাকে দেখবেন, তোমার সঙ্গে কথা বলবেন।

রাণুদি বললেন, আমার একটা কী যেন জিনিস হারিয়ে গেছে, মনে করতে পারছি না...আমার কী হারিয়েছে তোমরা বলতে পারো?

অভিজিৎ বললো, দিদি, তোমার কিছু হারায়নি তো!

রাণুদি বললেন, তোরা জানিস না, তোরা কেউ জানিস না, উঃ, মা, আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। আমি আর পারছি না।

অজিতদা সতীশবাবুকে বললেন, এঁকে জোর করে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া উচিত। এঁর পক্ষে এখন বেশী কথা না বলাই বোধহয় ভালো।

রাণুদির মা, অভিজিৎ, সঞ্জয়, ঝুমারা দু'পাশ থেকে রাণুদিকে জোর করে ওঠাবার চেষ্টা করলো। আমরাও হাত লাগাবো কি না বুঝতে পারছিলাম না। আমরা একটাও কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম।

রাণুদি কান্না কান্না গলায় বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও তোমরা। ভগবান রাগ করবেন।

এমন সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো। রাণুদি যে গাছটা দেখিয়েছিলেন, সেটার মধ্যে সরসর করে একটা শব্দ হলো। অমনি গাছটার ওপর আবার টর্চের আলো পড়তেই দেখা গেল, সেখানে রয়েছে একটা গিরগিটি। এরকম গিরগিটি এখানে খুবই দেখা যায়, এত লোকজন দেখে বেচারা খুবই ঘাবড়ে গিয়ে ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে আছে।

রাণুদি সেদিকে তাকিয়ে উত্তেজিতভাবে বললেন ঐ যে, ঐ যে দ্যাখো, ঐ যে ভগবান!

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমরা হো হো করে হেসে উঠলাম। এমন কি যে সতীশবাবু একটু আগে বললেন, সব কিছুর মধ্যেই ভগবান আছেন, তিনিও না হেসে পারলেন না।

উৎপল বললো, একটা খাঁটা-টাঁচা থাকলে এক্ষুনি ভগবনকে ধরে ফেলা যেত।

আমাদের হাসি শুনেই বোধহয় রেগে গেলেন রাণুদি। হঠাৎ সকলের হাত ছাড়িয়ে দৌড় মারলেন নদীটার ধার ঘেঁষে।

বেশীদূর যেতে পারলেন না অবশ্য, তার আগেই অজিতদা লম্বা লম্বা পায়ে ছুটে গিয়ে ধরে ফেললেন ওঁকে। আমরাও ছুটে গিয়েছিলাম, অবশ্য, কিন্তু অজিতদার আগে পৌঁছোতে পারিনি।

অজিতদার হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলেন রাণুদি। পারলেন না। অজিতদা ধীর গম্ভীর গলায় বললেন, বাড়ি চলুন।

রাণুদি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি...তুমি কে? তুমি কি সত্যময়ের ভাই?

অজিতদা বললে, না, আমার নাম অজিত রায়। আপনি আমাকে চিনবেন না।

রাণুদি হঠাৎ আবার কেঁদে ফেললেন, আমার জিনিসটা তোমরা কেউ খুঁজে দেবে না, শুধু শুধু তোমরা আমায় কষ্ট দিচ্ছো কেন?

অজিতদা আমাদের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, নিয়ে চলো!

আমরা রাণুদিকে জড়িয়ে ধরে ঠেলতে লাগলাম, অজিতদা শক্ত করে ধরে রইলেন এক হাত। রাণুদি ছটফটিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি যাবো না, আমার একটা জিনিস হারিয়ে গেছে ছেড়ে দাও।

সেই অবস্থাতেই আমরা জোর করে নিয়ে আসছিলাম, রাস্তার ওপর উঠে হঠাৎ রাণুদি আবার শান্ত হয়ে গেলেন। শরীর শক্ত করে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, তোমরা সবাই মিলে আমায় ঠেলছো কেন? আমি কি হাঁটতে পারি না? আমাকে নিজে নিজে যেতে দাও, প্লীজ।

আমরা রাণুদিকে ছেড়ে দিয়ে গোল করে ঘিরে রাখলাম। রাণুদি কিন্তু আর পালাবার চেষ্টা করলেন না। রাণুদি এদিক ওদিক তাকিয়ে নিজের মাকে খুঁজে পেয়ে এগিয়ে গিয়ে মায়ের হাত ধরলেন। তারপর খুব কাতর গলায় বললেন, মা, আমি পারছি না, খুব চেষ্টা করছি, কিন্তু এক এক সময়...মা আমি পাগল হতে চাই না, আমি পাগল হতে চাই না....

সে কথাটা শুনে আমারও কান্না পেয়ে গেল। রাণুদির তো কোনো দোষ নেই। ওঁদের বংশে কে একজন পাগল ছিল, সেই জন্য ওঁকেও পাগল হয়ে যেতে হবে? এই কি ঈশ্বরের নিয়ম? তাহলে কী করে মানবো যে ঈশ্বর বলে কিছু আছে?

বাকি রাস্তাটা রাণুদি নিজেই স্বাভাবিকভাবে হেঁটে এলেন, আমরাও ফাঁক ফাঁক হয়ে গেলাম। খানিকবাদে একটা টাঙ্গার ঝমঝম আওয়াজ পেলাম। বড়মামা ফিরে এসেছেন। থানায় খবর দেওয়া হলেও পুলিশ কেউ সঙ্গে আসেনি, তারা পরে যা হয় ব্যবস্থা নেবে বলেছে।

বড়মামা খুব স্নেহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছিল রাণু? কোথায় গিয়েছিলি?

রাণুদি বললেন, জানি না বড়মামা, আমি কিছু জানি না।

—তুই আজ সন্ধেবেলা মায়ের প্রসাদও খাসনি! আয়—

সবাই মিলে গিয়ে বসলাম মন্দিরের সামনের চাতালে। রাণুদির মা আমাদের প্রসাদ দিতে লাগলেন। অজিতদাকে অবশ্য আর দেখতে পেলাম না। অজিতদা গেটের বাইরে থেকেই নিশ্চয়ই চলে গেছেন।

রাণুদির মাও খোঁজ করলেন অজিতদার। তিনি নেই দেখে আফসোস করে বললেন, চল গেল? অনেক উপকার করেছে ছেলেটি! অতদূর...নদীর ধারে পাথরের আড়ালে বসেছিল রাণু....ঐ ছেলেটি না দেখলে সারা রাত ওকে খুঁজেই পাওয়া যেত না....কী যে হতো।

আমরা সবই অজিতদার কৃতিত্ব মেনে নিলাম। সত্যি, ওঁর জন্যই আজ রাণুদিকে ফিরে পাওয়া গেছে। কাল সকালেই একবার অজিতদাকে গিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে আসতে হবে।

রাণুদির মা বললেন, তোমরা চেনো ছেলেটিকে? ওকে একবার ডেকে এনো তো আমার কাছে।

রাণুদি মা বেশ শক্ত মহিলা। ওঁর এক মেয়ের তো এই অবস্থা, কয়েকদিন আগে অভিজিৎ জলে ডুবে গিয়েছিল—এসব সত্ত্বেও ওঁকে কখনো একেবারে ভেঙে পড়তে দেখিনি। মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলেন বটে, আবার একটু বাদেই নিজেকে সামলে নেন।

বড়মামা ভেতর থেকে একটা ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জ হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। রাণুদির পাশে এসে বললেন, একটা ইঞ্জেকশান দিতে হবে যে? দিই?

রাণুদি ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ জানালেন।

বড়মামা বললেন, এখানেই দেবো, না ভেতরে গিয়ে শুবি?

—এইখানেই দাও।

সেই ইঞ্জেকশানটা দেবার প্রায় দশ মিনিটের মধ্যেই রাণুদির চোখ ঘুমে ঢুলে এলো। তখন আমরাও চলে এলাম আমাদের বাড়িতে।

সারাদিন জসিডি-দেওঘরে ঘোরাঘুরি করেও আমরা একটুও ক্লান্ত হইনি, কিন্তু রাণুদিকে খোঁজাখুঁজি করার পর্বটার জন্যই আমরা যেন বেশ অবসন্ন বোধ করলুম। রাণুদির কথাটা ভাবলেই মনটা ভাল হয়ে যায়। রাণুদি হঠাৎ হঠাৎ এখানে সেখানে চলে যান। এরপর থেকে কি ওরা রাণুদিকে ঘরে আটকে রাখবে?

পরদিন সকালে অজিতদার বাড়ি আর যেতে হলো না আমাদের। অজিতদাই এসে হাজির হলেন। আমাদের তখন সদ্য ঘুম ভেঙেছে, পরীর ডাকাকাকি শুনে নিচে গিয়ে ওঁকে দেখতে পেলাম।

অজিতদা বললেন, তোমাদের কাছে একটু চিনি ধার করতে এলাম। আমার চিনি ফুরিয়ে গেছে। বাজার থেকে চিনি এনে চা করতে অনেক দেরি হয়ে যাবে, সেই জন্য—

ভাস্কর বললো, আপনি আমাদের এখানেই চা খেয়ে যান না।

শুধু চা নয়। দেওঘর থেকে দু'বাক্স প্যাড়া এনেছিলাম আমরা। সেই প্যাড়াও জোর করে খাওয়ালাম ওঁকে। আমরা চারজনে যেন রীতিমত একটা সংসার চালাচ্ছি। কোন বেল কী রান্না হবে, তা আমরাই বলে দিই। এমনকি, বাড়িতে অতিথি এলেও আমরা মিষ্টি খেতে দিতে পারি।

ভাস্কর জিজ্ঞেস করলো, আপনি অন্ধকারের মধ্যে ঐ জায়গায় রাণুদিকে দেখতে পেলেন কী করে?

অজিতদা বললেন, রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর আমার খানিকক্ষণ বাইরে হাঁটা অভ্যেস। সেই হাঁটতে হাঁটতে ঐ কেন্ট নালাটার দিকে গিয়েছিলাম, হঠাৎ শুনলাম কে যেন কাঁদছে....বেশ ফুপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, রাণুদি কাঁদছিলেন?

হ্যাঁ। আমি তাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। প্রথমে ভেবেছিলাম কোনো আদিবাসী মেয়ে-টেয়ে হবে। সেই বা কাঁদছে কেন জানার জন্য কৌতূহল হলো। তারপর শুনলাম, মেয়েটি ঐ নালাটা থেকে আঁজলা করে জল তুলে মাথায় দিচ্ছে আর বিড়বিড় করে বলছে, আমার মাথা শান্ত করে দাও, হে ভগবান, আমি তো তোমার সব কথা শুনি, তবু কেন আমি পারি না...পারি না...। এসব শুনে খুবই অবাক হলাম। তখন আমি একটু গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কে? আপনি এখানে বসে আছেন কেন? ব্যস, আমি কথা বলা মাত্রই মেয়েটি একেবারে চুপ! আর আমি যত কথাই জিজ্ঞেস করি, কোনো উত্তর নেই। আমি বাড়ি ফিরেই যাচ্ছিলাম, তবু মনে হলো, ভদ্রঘরের মেয়ে, ওখানে একা বসে থাকা ঠিক নয়, তারপর এদিকে গোলমাল শুনতে পেয়ে বুঝলাম।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ভাস্কর বললো, রাণুদি কিন্তু এমনিতে খুব ভালো।

অজিতদা বললেন, হুঁ!

আশু বললো, রাণুদির মা আপনাকে একবার ওবাড়িতে নিয়ে যেতে বলেছেন।

উৎপল বললো, এখুনি চলুন না। একবার ঘুরে আসবেন।

আমি বললুম, সেই ভালো। রাণুদিকেও একবার দেখে আসা যাবে।

অজিতদা বললেন, অন্য এক সময় যাবো। আমার একটু দরকার আছে, এখুনি একবার বেরুতে হবে।

ভাস্কর বললো, চলুন না, কতক্ষণ আর লাগবে?

অজিতদা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, যাবো। কাল রাত্তিরে ওর পর আর কোনো গণ্ডগোল করেনি তো মেয়েটি?

আমি বললাম, তারপরই তো ওকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হলো। সেইজন্য সকালবেলা একবার দেখতে যাবো।

এই সময় সঞ্জয় এসে উপস্থিত হলো। ওর মা ওকে পাঠিয়েছে। সকাল বেলা ওদের বাড়িতে আমাদের সকলের জলখাবারের নেমন্তন্ন।

অজিতকে দেখে সঞ্জয় বললো, আপনিও চলুন!

অজিতদা হেসে জিজ্ঞেস করলেন, জলখাবারে কী কী আইটেম?

সঞ্জয় বললো, লুচি আর আলুর দম আর মালপো।

অজিতদা বললেন, বাঃ শুনলেই জিভে জল আসে, কিন্তু আমি ভাই এখন যেতে পারছি না যে, একবার জসিডি যেতেই হবে, ন'টা চল্লিশে ট্রেন...

অজিতদাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আমরা চলে এলাম সঞ্জয়দের বাড়িতে। শুনলাম, রাণুদি তখনো ঘুমোচ্ছেন।

রাণুদির বদলে ঝুমা আজ তুলছে পুজোর ফুল। ফুল তুলবার সময় বোধহয় শাড়ি পরতে হয়, কেন না, এর আগে কক্ষনো শাড়ি পরা অবস্থায় দেখিনি, সে স্লাকস আর পাঞ্জাবি পরতে ভালবাসে। শাড়ি পরে তাকে অন্যরকম দেখাচ্ছে।

ঝুমার সঙ্গে আমাদের ভাব হয়েছে এর মধ্যে, তবু এখনো একটু অহঙ্কারী অহঙ্কারীভাবে তাকায়। যেন আমরা ওর তুলনায় ছেলেমানুষ। আমাদের মধ্যে একমাত্র ভাস্করই ঝুমার সঙ্গে একটু বেশী আগ্রহ নিয়ে কথা বলে।

পুজো করার সময় বড়মামা গায়ে একটা লাল চাদর জড়ানো থাকে। গম্ভীর গলায় সংস্কৃত মন্ত্র পড়ছেন আর এক হাতে ঘণ্টা বাজাচ্ছেন। ইনিই আবার কাল ইঞ্জেকশান দিলেন রাণুদিকে। খুব সংকটের সময় ইনি কালীঠাকুরের চরণামৃতের বদলে ওষুধপত্রের ওপরেই নির্ভর করেন।

বাগানে কুড়ি, পঁচিশজন দেহাতী নারী পুরুষ আছে। আজ শনিবার, আজ বড়মামা বাইরের লোকদের ওষুধ দেন।

পুজো শেষ করেই বড়মামা একটি সিগারেট ধরালেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাতে এক কাপ চা এনে দেওয়া হলো। আমাদের দেখে তিনি বেশ উৎফুল্লভাবে বললেন এসে গেছো? আজ আর কোথাও বেড়াতে যাওনি বুঝি? আর যে কত দেখবার জায়গা বাকি রয়ে গেল।

ভাস্কর বললো, কাল গিরিডি ঘুরে আসবো ঠিক করেছি।

বড়মামা বললেন, বেশ তোমরা খাবার-টাবার খেয়ে নাও। আমি ততক্ষণ রুগী দেখে নিই।

বড়মামা রাণুদি সম্পর্কে কোনো কথাই বললেন না। কালকের রাত্তিতের ঘটনায় আমরা এখনো উত্তেজিত হয়ে আছি, ওঁর মধ্যে তার চিহ্ন নেই কোনো। এর আগেও অভিজিৎ যেদিন জলে ডুবে গিয়েছিল, সেদিই দুপুরের পর থেকে তিনি ঐ ঘটনা আর উল্লেখ করেন নি একবারও। আমাদের কাছে এগুলো এক একটা সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার, বারবার মাথায় ঘুরে ফিরে আসে। অবশ্য আমাদের জীবনে এসব অভিজ্ঞতা নতুন,বড়মামা নিশ্চয়ই এরকম অনেক দেখেছেন। কিংবা বয়স বাড়লে মানুষ সব কিছুকেই অবশ্যম্ভাবী বলে ধরে নেয়?

বড়মামা যখন রুগী দেখতে লাগলেন, আমরাও দাঁড়িয়ে রইলাম। উনি বসলেন বাগানেই একটা চেয়ার টেবিল পেতে। কী দারুণ যত্ন করে উনি প্রত্যেকটি রুগীকে দেখেন। বিনা পয়সাতে যে কত আন্তরিকভাবে চিকিৎসা করা সম্ভব, কে জানতো! প্রত্যেকটি রুগীকে প্রশ্ন করে করে তিনি ওদের নাড়ী নক্ষত্র জেনে নিচ্ছেন। ওদের কথা শুনছেন মন দিয়ে। কারুর কারুর হাতে ওষুধ তুলে দেবার পর বলছেন, আগের বারের মতন এবারও যদি শুনি তুই এক সঙ্গে সব কটা ওষুধ খেয়ে ফেলেছিস, তাহলে তোর মাথা গুঁড়ো করে দেবো!

বড়মামা যেন এখন অন্যমানুষ। ইনিই ভক্তি করে কালীপুজো করেন। আবার কালীর সামনেই সিগারেট খান, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাস খেলে কাটান, আবার তিনিই এখন গরীব দুঃখী মানুষদের জন্য অন্তর ঢেলে দিচ্ছেন।

এক এক সময় আমার মনে হয়, একজন মানুষের মধ্যেই অনেকগুলো মানুষ থাকে।

দুপুরবেলা উৎপল যাবে বড়মামার সঙ্গে তাস খেলতে। আমি যেতে চাইলাম না। ওরা কোনোদিনই আমাকে চান্স দেয় না, পাশে বসিয়ে রাখে। তার থেকে বাড়িতে শুয়ে থাকা ভালো।

উৎপল বললো, চল্ না, শুধু শুধু ঘুমিয়ে কাটাবি কেন দুপুরটা।

ভাস্কর বললো, ও বাড়িতে গিয়ে ঝুমার সঙ্গে প্রেম করতে পারিস, আমরা তো থাকবো না, বেশ একা-একা।

আমি বললাম, আমায় খেলতে দে আর তুই ঝুমার সঙ্গে প্রেম কর গিয়ে।

উৎপল বললো, ধ্যাৎ! তুই এখনো ফোর ক্লাবস-এর পর কা নো ট্রামপস ডাকতে হয় সেটাই শিখতে পারলি না, তোকে কেউ খেলতে নেয়।

আমি বললুম, আমি শুয়ে শুয়ে বই পড়বো, সেই ঢের ভালো। যা তোরা ঘুরে আয়।

দুপুরবেলা ঝুমাও নিজের ঘরে বসে পড়ে। দু-একবার সেখানে গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলতে গেছি, কিন্তু কেন জানি না, ও যেন আমাকেই বিশেষ করে পাত্তা দেয় না। আমার খুব রোগা চেহারা বলে? আশুর একটা ফুল প্যাণ্ট আমি ধার করে পরছি, সেটাতে আমাকে যথেষ্ট ভালো দেখায় এখন।

যাই হোক, ওতে আমারও কিছু যায় আসে না। ওরকম ডাঁটিয়াল মেয়েদের আমিও পছন্দ করি না মোটেই।

ওরা চলে যাবার পর আমি শুয়ে শুয়ে বই পড়তে লাগলাম। এত বড় বাড়িটাতে আমি এখন একা। এই কথাটা ভাবলেই একটু অন্যমনস্ক হয়ে যেতে হয়। কলকাতার তুলনায় এখানকার দুপুরগুলো কী অসম্ভব নিস্তব্ধ। এই বাড়িটা শহরের বাইরের দিকে বলে প্রায় একটাও গাড়ি ঘোড়ার আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায় না। এখান থেকে টাঙ্গা ধরতে হলে প্রায় এক মাইল হেঁটে যেতে হয়।

একটা কাক শুধু একটানা কা-কা করে ডেকে যাচ্ছে। সেই ইষ্টকুটুম পাখিটাকে যে প্রথম দিনই এসে দেখেছিলুম, তারপর আর একদিনও দেখতে পাই না। ওর কাজ কি শুধু অতিথি এসেছে কি-না দেখে যাওয়া?

প্রায় ঘণ্টাখানেক বই পড়ার পর একটু ঝিমুনি এসে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। ফাঁকা বাড়িতে একলা ঘুমিয়ে পড়ার কোনো মানে হয় না। নিচের দরজাটা খোলা, যদি কোনো চোর ফোর ঢুকে পড়ে?

উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসতেও আলস্য লাগছে।

এক সময় সিঁড়িতে ধুপধাপ করে পায়ের শব্দ হলো।

আমি প্রথমে একটু চমকে গেলেও, পরের মুহূর্তেই বুঝে গেলাম। কোনো বয়স্ক লোক এভাবে সিঁড়ি দিয়ে ওঠে না।

সঞ্জয় দরজার পাশ দিয়ে উঁকি মেরে বললো, নীলুদা, তুমি ঘুমোচ্ছো?

আমি বই মুড়ে রেখে বললাম, না। এসো।

—তবে যে ভাস্করদারা বললো, গিয়ে দেখবি নীলুদা ভোঁসভোঁস করে ঘুমোচ্ছে?

আবার সিঁড়িতে পায়ে শব্দ। এবার অভিজিৎ।

সে বললো, তুমি তো জেগেই আছো। ব্যাডমিন্টনের সেটটা একটু দেবে, আমরা খেলবো। তুমি খেলবে?

সঞ্জয় বললো, এই, তুই দিদিকে একলা রেখে এলি?

অভিজিৎ বললো, র‍্যাকেটগুলো তুই নিয়ে আয়। দেরি করছিস কেন?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ দিদি? রাণুদি?

সঞ্জয় বললো, হ্যাঁ। মা বলেন, দিদিকে কখনো একলা ছাড়া হবে না, যেখানে যাবে, আমরাও যাবো।

ব্যাডমিন্টনের নেটটা ওদের দেখিয়ে বললাম, চলো, নিয়ে চলো।

তরতর করে আমি চলে এলাম নিচে।

রাণুদি আমাদের বাড়ির সামনেই একটা গাঁদা ফুলের গাছের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন। একটু দূরে দাঁড়িয়ে পরী ওকে তির্যকভাবে দেখছে।

রাণুদি আমার দিকে চোখ তুলে বললেন, ওরা তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিল বুঝি?

আমার সারা শরীরে একটা আনন্দের শিহরণ হলো। রাণুদি আজ ভালো মুডে আছেন। ওঁর মুখের একটা কথা শুনলেই বোঝা যায়, এখন আর কোনো গোলমাল হবে না।

অভিজিৎরা সব কিছু নিয়ে নেমে এসেছে।

একদিকে শুধু একটা বাঁশ পুঁততে হয়েছে, আর একদিকে বেশ সুবিধেমতন জায়গায় একটা পেয়ারা গাছ আছে। সেখানেই বেশ কায়দা করে নেটটা বাঁধা যায়।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, রাণুদি আপনি খেলবেন?

রাণুদি বললেন, না! তোমরা খেলো। আমার একটু একটু মাথা ব্যথা করছে।

আমি তবু জোর করে বললুম, একটু খেলুন না, দেখবেন মাথা ব্যথা সেরে যাবে।

অনিচ্ছার সঙ্গে রাণুদি একটা র‍্যাকেট হাতে তুলে নিলেন। আমি আর সঞ্জয় একদিকে এসে দাঁড়ালাম। ওদিকে রাণুদি আর অভিজিৎ।

র‍্যাকেট চালানো দেখলেই বোঝা যায়, রাণুদি বেশ ভালোই খেলতে পারতেন। কিন্তু আজ মন নেই। একটু বাদেই বললেন, নাঃ তোমরা খেল,আমি পারছি না।

কিছুক্ষণ আমি পেটাপেটি করলাম ওদের সঙ্গে। সঞ্জয় আর অভিজিৎ একদিকে আর আমি একলা। কিন্তু এসব কাচ্চাবাচ্চার সঙ্গে খেলে সুখ নেই। একটা চাপ তুলতে পারে না। ওর ক্যারামে আমায় হারিয়ে দিতে পারে বটে কিন্তু ব্যাডমিন্টনে আমার তুলনায় পিঁপড়ে।

আমিও দাঁড়িয়ে বললাম, এবার তোমরা দুজনে একটা গেম খেলো। আমি আসছি।

রাণুদি সেখানে নেই। আমি আগেই লক্ষ্য করেছিলাম, রাণুদি বাড়ির ভেতরে গেছেন। নিচের তলার ঘরগুলোর উঁকি মেরে দোতলায় উঠে এলাম।

রাণুদি আমাদের ঘরের খাটে শুয়ে আছেন, চোখ বোজা, দু' আঙুল দিয়ে টিপে ধরে আছেন কপালটা।

আমার পায়ের শব্দ শুনেই রাণুদি চোখ মেরে উঠে বসলেন।

আমি বললুম, শুয়ে থাকুন না! খুব বেশী মাথা ব্যথা করছে?

—হ্যাঁ।

আমি দুরুদুরু বক্ষে জিজ্ঞেস করলাম, আমি আপনার মাথা টিপে দেবো।

রাণুদি একটুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর বললেন না!

খাট থেকে নেমে এসে বললেন, তোমরা যে আমাকে পাহাড়ে নিয়ে যাবে বলেছিলে? গেলে না?

—নিশ্চয়ই যাবো। আপনি কবে যাবেন বলুন?

আমার খুব কাছে এসে, প্রায় আমার মুখের কাছে মুখ এনে রাণুদি অদ্ভুত কাতর, শূন্য গলায় বললেন, জানো, নীলু, মাথা ব্যথা করলেই আমার ভয় হয়। যদি আমি পাগল হয়ে যাই আবার!

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, না, না, আপনার কিচ্ছু হবে না!

—আমায় এক বছর নার্সিং হোমে রেখেছিল। সেখানে যে আমার কী খারাপ লাগে। আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে। ওরা আমায় খুব কষ্ট দেয়, জানো? খারাপ কথা বলে।

আমি বাবাকে বলেছিলাম, বাবা, তোমার পায়ে ধরছি, আমাকে নার্সিংহোমে বন্দী করে রেখো না, আমি ভালো হয়ে যাবো, কথা দিচ্ছি, ভালো হয়ে যাবো।

—আপনি তো ভালই হয়ে গেছেন রাণুদি।

—কাল রাত্তিরে যে আবার পাগল হয়ে গিয়েছিলাম! আচ্ছা নীলু, কাল কি আমি খুব বেশী পাগল হয়ে গিয়েছিলাম? খুব?

—না, না।

—তাহলে তোমরা সবাই মিলে আমায় ঠেলছিলে কেন? পাগলকেই তো লোকে ওরকম করে।

এই কথার আর কী উত্তর দেবো, আমি মাথা নিচু কের রইলাম।

—কাল আমি একা একা কোথায় চলে গিয়েছিলাম। আমার কিছু মনে নেই। সেই জায়গাটা আমায় দেখাতে পারো?

—হ্যাঁ।

—চলো তো!

—অনেকটা দূরে কিন্তু। আপনি হাঁটতে পারবেন? আপনার মাথা ব্যথা করছে।

মাথা ব্যথা করার সময় শুয়ে থাকলেই আমার বাড়ে।

—কোনো ওষুধ খাবে না?

—আমার সব ওষুধ শেষ হয়ে গেছে। তুমি যাবে?

নিচে এসে দেখি অভিজিৎ আর সঞ্জয় লাফিয়ে লাফিয়ে র‍্যাকেট ঘোরাচ্ছে। আমি বললুম, আমি একটু রাণুদিকে নিয়ে ঘুরে আসছি। তোমরা খেলো। বৃষ্টি এলে সব ভেতরে তুলে দিও কিন্তু।

অভিজিৎ আর সঞ্জয় খেলা থামিয়ে শতকে দাঁড়ালো। তাকালো পরস্পরের দিকে। আমি বুঝতে পেরে বললাম, ভয় নেই, আমিই তো সঙ্গে যাচ্ছি। ঠিক ফিরিয়ে নিয়ে আসবো।

তারপর ওদের কাছে গিয়ে নিচু গলায় বললাম, কাল রাত্তিরের সেই নদীটার কাছে যাচ্ছি। তোমরাও একটু বাদে ওদিকে চলে আসতে পারো।

রাণুদি ততক্ষণে গেটের কাছে চলে এসেছেন। আমি দৌড়ে এসে ওঁকে ধরে ফেললাম।

রাণুদি আজ পরে আছেন নীল রঙের একটা শাড়ি। ওঁর ফর্সা শরীরের সঙ্গে নীল রঙটা বেশ মানায় চুলগুলো সব খোলা। রাণুদিকে আমি কখনো খোঁপা বাঁধতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

এই যে আমি রাণুদির পাশে হেঁটে যাচ্ছি, এতেই আমার অসম্ভব আনন্দ হচ্ছে। এটা যেন আমার দারুণ সৌভাগ্য।

আনন্দে মশগুল হয়ে আমি চুপচাপ ছিলাম। তারপর এক সময় মনে হলো, রাণুদিকেও চুপচাপ থাকতে দেওয়া উচিত নয়। চুপ করে থাকাই তো রাণুদির প্রধান অসুখ। কথা বললেই রাণুদি ভালো হয়ে যাবেন।

—রাণুদি, আপনি কোন কলেজে পড়তেন?

—ব্রেবোর্ণে।

—তাই নাকি? আমার দু'জন মাসিও ওখানে পড়ে। আমার আর মাসির নামও রাণু। সে অবশ্য ইউনির্ভাসিটিতে পড়ে এখন।

—আমিও ইউনির্ভাসিটিতে ভর্তি হয়েছিলাম কিন্তু আর পড়া হলো না....তখন থেকেই আমার বেশী মাথা খারাপ হলো, খুব ভীষণ পাগল হয়ে গেলাম।

—রাণুদি, ও কথা আর বলবেন না। আপনি তো এখন ভালো হয়ে গেছেন।

—আমি ভালো হয়ে যাই নি, নীলু। আমি জানি। কিন্তু আমি ভালো হতে চাই। জানো, ইউনির্ভার্সিতে একদিন আমি ক্লাসের মধ্যে এমন হয়ে গেলাম হঠাৎ নাচতে আরম্ভ করলাম একদম স্যারের সামনে। বলেই রাণুদি ফিক-ফিক করে হাসতে আরম্ভ করলেন। আমার কাঁধে একটা চাপড় মেরে বললেন, ভাবো তো, ক্লাসের মধ্যে কোনো ছাত্রী যদি নেচে ওঠে একেবারে ধেইধেই করে...সব ছেলেমেয়েরা দারুণ চ্যাঁচামেচি করতে লাগলো.....তারপর কী হয়েছিল আমার মনে নেই—

—সে কতদিন আগেকার কথা?

—তিন বছর। তারপর ছ'মাস বাদে আমি আবার ভালো হয়ে গিয়েছিলাম। আবার ভাবলাম পড়বো, পরীক্ষা দেবো...হলো না, তিন মাস পরই অজ্ঞান হয়ে গেলাম একদিন। যখন জ্ঞান হলো, নিজের নামটাও মনে করতে পারি না....আচ্ছা নীলু, তুমি আমার নাম জানো? বলো তো।

—আপনার নাম রাণু।

—ভালো নাম কী?

—তা তো জানি না।

—মাধুরী। মাধুরী সেনগুপ্ত। মনে রাখবে। আমার যদি হঠাৎ মনে হয়, আবার আমার নাম ভুলে যাচ্ছি, তোমাকে জিজ্ঞেস করে নেবো।

রাণুদির মুখে এসব কথা শুনলেই একটু ভয়-ভয় করে। আমি রাণুদিকে নিজের দায়িত্বে নিয়ে এসেছি, আমাকেই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বাবাঃ, নিজের নাম ভুলে যাওয়া কী সাঙ্ঘাতিক কথা। নিশ্চয়ই তখন রাণুদির খুব কষ্ট হয়েছিল।

খানিকটা দূর যাবার পর রাণুদি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যে আমার সঙ্গে এলে, তোমার নিশ্চয়ই খারাপ লাগছে।

—না, খারাপ লাগবে কেন?

—আমি তো পাগল, তোমার ভয় করে না? অনেকেই তো আমায় ভয় পায়।

—না রাণুদি। আমি আপনাকে একটুও ভয় পাই না। আমার খুব খুব ভালো লাগছে, আপনি বিশ্বাস করুন, দারুণ ভালে লাগছে।

রাণুদি ব্যাকুলভাবে বারবার বলতে লাগলেন, তোমার ভালো লাগছে, নীলু? সত্যি ভালো লাগছে? সত্যি?

এবার অদূরেই আমার সেই কদমগাছটা দেখতে পেলাম। আজও সেটা ফুলে ভরা। এই গাছ ভর্তি সমস্ত ফুল আমার। আমি সব রাণুদিকে দিয়ে দিতে পারি।

রাণুদি দৌড়ে জলের কাছে নেমে গেলেন। আজ যেন একটু বেশী জল এই নদীটায়। তবে সেইরকমই স্বচ্ছ জল, ভেতরে কয়েকটা পুঁচকে পুঁচকে মাছ দেখতে পাচ্ছি।

—ঐ যে ঐ পাথরটা, ওখানে আপনি বসেছিলেন।

রাণুদি পাথরটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। রাত্তিরবেলা ওখানে কোনো মানুষ বসে থাকলে রাস্তা থেকে দেখতে পাওয়া খুবই শক্ত।

—আমার কিচ্ছু মনে নেই, নীলু। মনে হচ্ছে, এ জায়গাটা আমি আগে কখনো দেখিই নি। আমি একটু বসবো এখানে।

—হ্যাঁ, বসুন না!

—বসলে...আমি যদি আবার পাগল হয়ে যাই?

—আঃ, রাণুদি, ও কথা বলবেন না। আপনি তো ভালো হয়ে গেছেন।

রাণুদি পাথরটার ওপর বসলেন পা ঝুলিয়ে। লাল রঙের চটি জোড়া ছুঁড়ে দিলেন এক পাশে, তারপর জলে পা ডোবালেন। পাথরের কাছেই যে জলের ঘূর্ণিটা, সেটা যেন রাণুদির পা দুখানি নিয়ে খেলা করতে লাগলো খুব খুশী হয়ে।

আমিও রাণুদির কাছেই বালির ওপর বসে জলের মধ্যে পা রাখলুম।

—আমি এখানে বসে কী করছিলুম, নীলু?

—আপনি চুপ করে বসেছিলেন শুধু। আপনি বলেছিলেন, ভগবান আপনাকে এখানে ডেকে এসেছেন।

—সত্যি বলেছিলাম?

—হ্যাঁ।

—কী জানি। আমি যখন পাগল হয়ে যাই, তখন বোধ হয় দেখতে পাই ভগবানকে। এমনিতে অন্য সময় তো পাই না। অন্য সময় কিচ্ছু মনে হয় না।

—আপনি আর একটাও মজার কথা বলেছিলেন। এই যে গাছটা এখানে একটা গিরগিটি বসেছিল, আপনি সেটাকে দেখিয়ে বললেন, ঐ যে ভগবান!

নদীর স্রোতের মতনই কুলকুল শব্দে হেসে উঠলেন রাণুদি। হাসতে হাসতেই বলতে লাগলেন একটা গিরগিটিকে....এমা.....একটা গিরগিটিকে ভগবান! পাগল হলে মানুষ কত অদ্ভুত কথা বলে! নীলু, তুমি আগে কোনো পাগল দেখেছো?

—না।

—আমিও দেখিনি। মানে, রাস্তায় দেখেছি, কিন্তু চেনাশুনো কারুকে দেখিনি...শেষে কিনা আমি নিজেই পাগল হলাম! আমি বুঝতে পারি, অজনো, এক এক সময় আমি আগে থেকেই টের পাই যে আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে, ঠিক যেন একটা ঝড় ওঠে...বাইরের সব শব্দ একটু একটু করে মুছে যায়; সেই ঝড়ের শব্দ ছাড়া আমি আর কিছু শুনতে পাই না...আমি চেষ্টা করি, ভীষণভাবে চেষ্টা করি নিজেকে সামলাবার, আমার তখন সাঙ্ঘাতিক কষ্ট হয়।

রাণুদি দু হাতে মুখ ঢেকে ফেললেন। কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো ওর শরীর। একটু বাদে যখন হাত সরালেন, ওঁর দু'চোখে তখনও জল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ফেললেন।

আমার বুকটা যেন গুঁড়িয়ে যেতে লাগলো। আমি কি কিছুতেই রাণুদির দুঃখ দূর করতে পারি না? একটা যদি কোনো মন্ত্র পেতাম, সেই মন্ত্রের জোরে আমি দুনিয়ার সব মানুষের দুঃখ ঘুচিয়ে দিতে পারতাম যদি।

সেরকম কোনো মন্ত্র আমি জানি না, কিন্তু বদলে আর কী দিয়ে আমি রাণুদির মন ভোলাতে পারি? এই নদীটা আমি দিতে পারি রাণুদিকে, এই আকাশ।

—রাণুদি আপনি কদমফুল ভালোবাসেন?

—হ্যাঁ। আমি সব ফুল ভালোবাসি।

—দাঁড়ান, আমি আসছি।

দৌড়ে গিয়ে কদমগাছটায় চড়ে বসলাম। বেশ তাড়াহুড়োতে একটা পাতলা ডালে পা দিতেই সেটা মড়াৎ করে ভেঙে গেল, আমি পড়ে যাচ্ছিলাম আর একটু হলে। গাছটাকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, নিই? তোমার থেকে ফুল নিই? ফুল তো পরের জন্যই। তোমার ফুলের এর চেয়ে বেশী ভালো ব্যবহার হতে পারে না।

প্রায় কুড়ি পঁচিশটা ফুল ছিঁড়ে এনে ফেলে দিলাম রাণুদির কোলের ওপর।

রাণুদি খুব খুশী হয়ে বললেন, এত?

তখনই রাণুদিকে মনে হলো দেবীর মতন। আমি যেন রাণুদিকে পুজো করছি। রোদ্দুরের একটা রেখা এসে পড়েছে রাণুদির পিঠের ওপর ছড়ানো ঝলক। নিটোল চিবুকটা নুইয়ে রাণুদি ফুলগুলো গন্ধ নিচ্ছেন, রাণুদির বুক, কোমর ও উরুতে যেন মাধুর্যের চুম্বক বসানো, নগ্ন পা দুটি খেলা করছে জলে। আমার ইচ্ছে হলো, রাণুদির পা দুটি আমার বুকে জড়িয়ে ধরি।

আমি টের পেলাম, আমার পুরুষাঙ্গ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। আমি এক পলকের জন্য পোশাকের নিচে রাণুদিকে আসল শরীরটা মনশ্চক্ষে দেখে নিলাম, রাণুদি যেন সম্পূর্ণ নিরাবরণ হয়ে বসে আছেণ ঐ পাথরটার ওপর। আমার নিশ্বাস গরম হয়ে গেল।

রাণুদি নিশ্চয়ই আমাকে ভাবছেন একটা বাচ্চা ছেলে। কিন্তু আমি তখন রাণুদিকে মনে মনে সব জায়গায় দারুণভাবে আদর করছি। আর মনে মনেই বারবার বলছি, রাণুদি, আমি তোমায় ভালবাসি, ভীষণ ভালবাসি, কত ভালবাসি তুমি জানো না।

রাণুদি জিজ্ঞেস করলেন, নীলু, আমায় তোমার মনে থাকবে?

—আপনাকে কোনোদিন ভুলবো না, রাণুদি।

কিন্তু আমি যদি তোমায় ভুলে যাই? কিচ্ছু বিশ্বাস নেই, আমি হয়তো ভুলে যেতে পারি, আমার অনেক কিছুই মনে থাকে না... তোমার সঙ্গে এসে কিন্তু আমার মাথার ব্যথাটা অনেকটা কমে গেল।

রাণুদি একটা ফুল ছুঁড়ে দিলেন জলে। সেটা দুলতে দুলতে ভেসে চললো। আমরা দু'জনেই সেদিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। কিছুই না, জল দিয়ে একটা ফুল ভেসে যাচ্ছে—অথচ এক এক সময় তা দেখতেই কত ভালো লাগে।

রাণুদি জিজ্ঞেস করলেন, এই ফুলটা কোথায় যাবে? অনেক দূর, তাই না? যেখানে এই নদীটা গিয়ে মিশেছে.....আমরা তো ইচ্ছে করলেই গিয়ে দেখতে পারি, এই নদীটা কোথায় গেছে। যাবে, নীলু?

—হ্যাঁ চলুন।

—এই নদীটা নিশ্চয়ই অন্য আর একটা নদীর সঙ্গে মিশিছে। আমরা কোন দিকে যাবো, নদীটা যেখান থেকে জন্মেছে, সেদিকে না নদীটা যেখানে গিয়ে পড়েছে?

—যেদিকে আপনার ইচ্ছে!

—কিন্তু কোনটা কোনদিকে আমরা বুঝবো কী করে?

—যেদিকে স্রোত, সেইদিকে যাই চলুন।

—না, আমি স্রোতের উল্টো দিকে যাবো।

ঠিক যেন একটা বাচ্চা মেয়ের মতন আবদার করা গলায় রাণুদি বললেন, এই কথাটা। তারপর হেসে উঠলেন। আবার বললেন, আমি তো পাগল, তাই সব সময় উল্টো কথা বলি।

রাণুদির মুখে 'পাগল' শব্দটা শুনতে আমার একটুও ভালো লাগে না।

রাণুদি পাথর থেকে নেমে জলের ওপর দাঁড়ালেন। শাড়ির পাড়টা ভিজে যাচ্ছে বলে একটু উঁচু করলেন শাড়িটা। গোড়ালি থেকে এক বিঘৎ ওপরে। ঠিক মাখন দিয়ে তৈরি রাণুদির পা। ইচ্ছে করে, জিভ দিয়ে চাটি।

রাণুদি আমার কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, চলো, আমরা জলের ভেতর দিয়েই যাবো কিন্তু।

রাণুদি আমাকে ছোট ভাইয়ের মতন ভেবে কাঁধে হাত রাখলেন খুব অনায়াসে। কিন্তু উনি জানেন না যে, যেখানে ওঁর হাতটা ছুঁয়েছে, আমার কাঁধের সেই জায়গাটা সঙ্গে সঙ্গে গরম হয়ে উঠলো। আমি রাণুদির শরীরের গন্ধ পাচ্ছি। আমার দুর্দান্ত ইচ্ছে করছে, রাণুদির বুকে আমার মাথাটা পাগলের মতন ঘষি।

কিন্তু আমাদের নদী উৎস বা মোহনা দেখতে যাওয়া হলো না। দূরে দেখলাম, সঞ্জয় আর অভিজিৎ ছুটে আসছে।

ওরা কোনো খবর আনছে ভেবে আমি থমকে দাঁড়ালাম। না, কোনো খবর নেই, অনেকক্ষণ ব্যাডমিন্টন খেলার পর হঠাৎ কর্তব্যবোধ জেগে উঠেছে ওদের।

রাণুদি বললেন, না, এখন যাবো না। তোরা যা।

ওরা দু'জনেই জলের মধ্যে নেমে এলো। সঞ্জয় বললো, এই নীলুদা, মা কিন্তু রাগ করবে!

আমি বললাম, রাণুদি, তা হলে আজ বাড়ি চলুন।

—না।

রাণুদি একা একাই এগিয়ে গেলেন খানিকটা। অভিজিৎ আর সঞ্জয় দু'জনে দু'দিক থেকে রাণুদিকে হাত চেপে ধরে বললো, এই দিদি!

—বলছি না যাবো না!

রাণুদি ওদের এমন জোরে ঠেলে দিলেন যে বেচারা দু'জন জলে পড়ে জামা-প্যান্ট ভিজিয়ে ফেললো।

রাণুদির চোখ বিস্ফারিত, শরীরটা শক্ত হয়ে গেছে। অসম্ভব রাগীভাবে তাকালেন আমার দিকে। আমি রাণুদিকে ধরতে সাহস পেলাম না।

রাণুদি আমায় জিজ্ঞেস করলেন, তুই যাবি না আমার সঙ্গে?

আমি কোনো উত্তর দিলাম না।

সঞ্জয় আর অভিজিৎ জল থেকে উঠে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাণুদির এরকম চেহারা আমি আগে দেখিনি। ওঁর পাগলামি মানে তো শুধু চুপ করে থাকা।

একটুক্ষণের মধ্যেই রাণুদি আবার সহজ হয়ে গেলেন। খুব বিস্মিতভাবে দুই ভাইকে জিজ্ঞেস করলেন, এই তোরা ভিজে গেলি কী করে?

সঞ্জয় মিনমিন করে বললো, দিদি, বাড়ি চলো।

রাণুদি বললেন, চল, বাড়ি যাচ্ছি! তোরা বড্ড ইয়ে, জল দেখলেই অমনি জল ঘাঁটতে হবে! নীলুকে দ্যাখ তো, কীরকম প্যান্ট গুটিয়ে নিয়েছে।

আমি একা স্বস্তি নিশ্বাস ফেললাম। জল থেকে ওপরে উঠে এসে রাণুদি বললেন, আমরা অনেকক্ষণ এখানে বসে আছি, তাই না? ইস, বড্ড দেরি হয়ে গেছে। চল, চল বাড়ি চল!

তারপর আমার দিকে চোখ কুঁচকে একটা ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত করে হাসিমুখে বললেন, আমরা চুপি চুপি, আর একদিন...এই নদীটা দেখতে...

তারপর কদমগাছটার কাছে এসে বললেন, আমায় এই গাছটা থেকে ফুল পেড়ে দিয়েছিলে? রোজ আমাকে কদম ফুল দেবে?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

অভিজিৎ বললো, আমিও গাছে উঠতে পারি।

রাণুদি বললেন, তুই গাছে উঠবি না। নীলু এনে দেবে, ও তোর চেয়ে বড়।

আমি বললাম, তা ছাড়া আমার এটা নিজস্ব গাছ।

রাণুদি হেসে ফেলে বললেন, তাই নাকি? ওমা, তোমার নিজস্ব গাছ আছে? আমার নেই কেন! আমার নিজস্ব কোনো জিনিসই নেই। আমার ছিল, আগে অনেক ছিল, কিন্তু সব হারিয়ে গেছে। আমার কী কী হারিয়েছে জানিস, খোকন, মিন্টু।

অভিজিৎ আর সঞ্জয় আমার দিকে তাকাল। রাণুদি মুখটা কুঁচকে ফেললেন। মনে হলো, তিনি নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছেন।

আমার দিকে চেয়ে আবার স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা নীলু, সত্যি করে বলো তো, কাল রাত্তিরে যে পাথরটায় বসেছিলাম, আজ তো আবার সেই পাথরটাতেই আমি বসলাম, তাহলে আজও কি আমি কোনো পাগলামি করেছি?

—না, একটুও না।

—আমার মনে পড়ছে না। সত্যি করে বলো।

—সত্যি বলছি, আপনি খুব ভালো আছেন।

রাণুদি যেন খুব নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন। হাসিমুখে বললেন, তাহলে চলো।

একটুখানি গিয়ে অজিতদার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে গেল। উনি বোধহয় ফিরছিলেন স্টেশন থেকে। আমাদের দেখে নিজের বাড়ির গেটের কাছে থমকে দাঁড়ালেন।

সঞ্জয় বললো, ঐ তো অজিতদা।

অজিতদা হাত তুলে নমস্কার করলেন রাণুদিকে।

রাণুদি বললেন, আমার নাম মাধুরী সেনগুপ্ত। এরা আমার ভাই। বোঝাই যাচ্ছে, কাল রাত্রে অজিতদাকে যে দেখেছেন, তা রাণুদির মনে নেই।

অজিতদাও নিজের নাম বললেন।

রাণুদি বললেন, আপনাকে আগে কোথায় দেখেছি মনে হচ্ছে।

অজিতদা মৃদু হেসে বললেন, তা হতে পারে। আপনাদের বাড়ির সামনে দিয়ে তো আমি প্রায়ই যাই।

—আপনি কি সত্যময়ের ভাই?

—না। আমার কোনো দাদা নেই। সত্যময় বলে তো কারুকে আমি চিনি না।

—আমাদের সঙ্গে সত্যময় বলে একজন পড়তো, খুব চেহারার মিল আপনার সঙ্গে। এই রকম ছোট ছোট দাড়ি....এই বাড়িটা আপনার?

—আমি এই বাড়িতে থাকি। আসুন না, ভেতরে এসে একটু বসবেন? তোমরাও এসো।

সঞ্জয় বললো, কিন্তু মা চিন্তা করবেন যে! মা বিকেলে বাড়ি ফিরতে বলেছেন।

রাণুদি বললেন হ্যাঁ, সত্যিই মা আমাকে বেশীক্ষণ থাকতে বারণ করেছেন। এমনিতেই দেরি হয়ে গেল....বাঃ আপনার বাগানে তো অনেক ফুল।

আসুন না, একটু বসে চা খেয়ে যাবেন, কতক্ষণ আর লাগবে।

সঞ্জয় বললো, আমি কাজ করি। আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি, মাকে খবর দিয়ে দেবো।

সেটাই খুব ভালো ব্যবস্থা। সঞ্জয় দৌড়ে চলে গেল।

অজিতদা গেট খুলে দিলেন। সেখানে ঢুকতে গিয়েও শতকে দাঁড়িয়ে রাণুদি হাসতে হাসতে বললেন, আপনি জানেন, আমি পাগল?

অজিতদাও হেসে বললেন, আমি এমন ওষুধ জানি, যাতে সব পাগলামি সেরে যায়।

সেই গেট পেরিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে রাণুদির জীবনে একটা নতুন পর্ব শুরু হলো।

॥৭॥

অজিতদা আর রাণুদির প্রেমের মতন, এমন প্রবল, প্রচণ্ড প্রেম আর কেউ কখনো দেখেছে কিনা সন্দেহ। দু-তিন দিনের মধ্যেই এমন হলো যে কেউ কারুকে যেন এক নিমেষের জন্যও দৃষ্টিছাড়া করতে পারে না। অবশ্য টানটা রাণুদির দিকে থেকেই যেন বেশী। রাণুদির এ এক নতুন পাগলামি।

ঘুম থেকে ওঠেই রাণুদি জিজ্ঞেস করেন, অজিত কোথায়?

অজিতদা থাকেন একা। একজন লোক ওঁর বাড়িতে রান্না করে দেয়। সেখানে রাণুদির সব সময় যাওয়াটা ভালো দেখায় না বলে রাণুদির মা অজিতদাকে ডেকে পাঠান তাঁদের বাড়িতে। রাণুদির কোনো ইচ্ছেতে বাধা দেওয়া যায় না।

অজিতদা যে বাড়িতে থাকেন, সে বাড়ির আগের মালিককে চিনতেন বড়মামা। বছরখানেক হলো বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে। নতুন মালিককে বড়মামা দেখেন নি। অজিতদার জামাইবাবু কিনেছেন, কিন্তু এর মধ্যে আসেন নি একবারও। অঝিতদাদা দিল্লির লোক, সেখানে অজিতদা ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন, কিছু দিনের জন্য ছুটি নিয়ে তিনি জামাইবাবুর নতুন বাড়িটায় থেকে যাবার জন্য এসেছেন। সেই সঙ্গে বাগান-টাগানগুলো পরিষ্কার আর কিছু কিছু সারানোর কাজও করে যাবেন।

অজিতদার ব্যবহারও খুব ভদ্র। রাণুদির সঙ্গে তিনি এমনভাবে মেশেন যাতে কোনোক্রমেই রাণুদির মনে আঘাত না লাগে। অজিতদার সঙ্গে থাকলে রাণুদি একদম ভালো হয়ে যান।

আমাদের বাড়িটাই হয়ে গেল কেন্দ্রস্থল।

রাণুদির মা আর কোনো ব্যাপারে আপত্তি না করলেও রাণুদিকে একা একা অজিতদার বাড়িতে পাঠাতে চান না। কখনো রাণুদি নিজে থেকে যেতে চাইলেও তখন সঞ্জয় আর অভিজিৎ সঙ্গে যাবেই। এদিকে রাণুদিদের বাড়িতেও অজিতদা রাণুদির সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতে অস্বস্তি বোধ করেন।

সেইজন্যই আমাদের বাড়িটা বেছে নেওয়া হয়েছে। একতলার বসবার ঘরে কিংবা বাগানের বেঞ্চে ওদের দু'জনকে সারাদিনের প্রায় যে-কোনো সময়েই দেখতে পাওয়া যাবে। আগে যেমন রাণুদি ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করে বসে থাকতেন এক জায়গায়, এখন ঠিক সেইরকমই তার চেয়েও বেশী সময় গল্প করেন অজিতদার সঙ্গে। কী যে অত গল্প কে জানে।

সঞ্জয় আর অভিজিৎ খেলতে আসে আমাদের বাড়িতে। এমন কি, দিদিকে পাহারা দেবার জন্যই কিনা কে জানে, ঝুমাও আসতে শুরু করেছে। ঝুমা ব্যাডমিন্টন খেলতে ভালোবাসে। ক'দিন ধরেই আকাশ পরিষ্কার। আমরা ব্যাডমিন্টনের একটা টুর্নামেন্টে শুরু করে দিয়েছি।

এক এক সময় অজিতদা আর রাণুদিও এসে যোগ দেন আমাদের খেলায়। ওঁরা দু'জন পার্টনার। তখন পাশাপাশি দু'জনকে চমৎকার মানায়। অজিতদা বেশ লম্বা আর চমৎকার শরীরের গড়ন, মুখে অল্প অল্প দাড়ির জন্য ওঁকে দেখায় সিনেমার নায়কের মতন। আর রাণুদির তো রূপের কোনো তুলনাই নেই। বিশেষত, রাণুদির মুখখানা যখন হাসি মাখানো থাকে, তখন রাণুদিকে কোনো স্বর্গের দেবী বলেই মনে হয় ঠিক।

ভাস্কর আমাদের দলের নেতা হিসেবে খানিকটা ভারিক্কি ধরনের। ওর সঙ্গে সঞ্জয়ের বড়মামা অনেক কিছু আলোচনা করেন। ভাস্করের মুখ থেকে আমরা অনেক খবর পেয়ে থাকি।

অজিতদা আর রাণুদির এমন উদ্দাম মেলামেশা নিয়েও বাড়িতে অনেক কথাবার্তা হয়েছে। বড়মামাই রাণুদির মাকে বুঝিয়েছেন যে রাণুদির ওপর এখন জোর করা ঠিক হবে না। তাতে ফল আরও খারাপ হতে পারে। গত তিন চার দিন যে একবারও রাণুদির ব্যবহার কোনোরকম অস্বাভাবিক কিছু দেখা যায় নি, সেটা ভালো লক্ষণ।

আর আগে অনেকবারই ওঁরা রাণুদির বিয়ের কথা চিন্তা করেছেন। কিন্তু ডাক্তাররা বিয়ে না দেবারই পরামর্শ দিয়েছেন ওঁদের। মেয়ে পাগল জানলে কেউ জেনে শুনে বিয়ে করবে না। আবার না জানিয়ে, এই ব্যাপারটা গোপন করে বিয়ে দিলে তার ফল খুবই খারাপ হতে পারে। তা ছাড়া রাণুদির মা বলেছেন, আমি যার তার হাতে আমার মেয়েকে দেবো না, তার চেয়ে বরং সারা জীবন ও আমার কাছেই থাকবে।

ভাস্করের কাছ থেকে আমরা আর একটা খবরও পেলাম। রাণুদির মা একদিন অজিতদাকে আলাদা ডেকে কয়েকটা কথা বলেছেন, সে কথা ভাস্কর শুনে ফেলেছে।

দৃশ্যটা এরকম।

অজিতদা আর রাণুদি বসেছিলেন ওঁদের বাড়ির বাগানে একটা বেঞ্চের ওপর। সন্ধেবেলা। এক সময় রাণুদি, 'একটু আসছি' বলে উঠে গিয়েছিলেন বাড়ির ভেতরে, খুব সম্ভবত বাথরুম-টাথরুম করবার জন্য। সেই সময় রাণুদির মা তাড়াতাড়ি চলে এসেছিলেন অজিতদার কাছে।

রাণুদির মা বলেছিলেন, বাবা অজিত, তোমাকে দু একটা কথা বলবো?

অজিতদা সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে বিনীতভাবে বলেছিল, হ্যাঁ, বলুন, মাসিমা!

রাণুদির মা বলছেন বসো, তুমি বসো। রাণু তোমাকে খুব পছন্দ করে, তা দেখে আমার খুব ভলো লাগে। রাণু তোমার সঙ্গে যতক্ষণ থাকে,খুব ভালো থাকে, ক'দিন ধরেই খুব ভালো আছে, এজন্য আমি যে কী শান্তি পেয়েছি, তা তোমাকে কী বলবো! তুমি আমাদের অনেক উপকার করেছো।

অজিতদা বললেন, আমার মনে হয়, ও পুরোপুরিই ভালো হয়ে যাবে।

—তা যদি হয়তো তার থেকে আনন্দের তো আর কিছু নেই। দেখেছো তো। মেয়েটা এমনিতে কত ভালো, ওর মনে কত দয়ামায়া, তোমাকে একটা কথা বলি, মেয়েটা খুব সরল, অনেক কিছুই বোঝে না, তোমার কাছে আমার অনুরোধ, তুমি দেখো, ওর যেন কোনো ক্ষতি না হয়।

—আমি ওর ক্ষতি করবো?

—সে কথা বলছি না। আমরা বড় দুঃখী, এ মেয়েটার জন্য আমার এক মুহূর্ত শান্তি নেই, তাই বলছি, তুমি পুরুষ মানুষ, দুদিন পর ছুটি ফুরোলে তোমাকে তো চলে যেতেই হবে, শুধু দেখো, ওর যেন কোনো ক্ষতি না হয়, ও তো কিছুই বোঝে না।

অজিতদা তখন রাণুদির মায়ের পা ছুঁয়ে বলেছে, মাসিমা, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমার দ্বারা ওর তো কোনো ক্ষতি হবেই না বরং আমি রাণুর ভার নিতে চাই, আমার কাছে ও ভালো থাকবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, রাণু আমার কাছে কোনো দিন কষ্ট পাবে না।

ভাস্কর খুব কাছাকাছি থেকে এটা দেখেছে ও শুনেছে ; এই ঘটনা জেনে অজিতদার প্রতি শ্রদ্ধায় আমাদের মন ভরে যায় ! রাণুদির জীবনে যে হঠাৎ এই পরিবর্তন আসবে, তা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নি।

রাণুদির বাবা প্রত্যেক শনিবার আসেন শুনেছিলাম। কিন্তু তাঁকে আমরা দেখিনি। তিনি আগের শনিবার আসেন নি, টেলিগ্রাম করে জানিয়েছেন যে আগামী সপ্তাহেও আসতে পারবেন না। উনি এলে আমরা সবাই এক সঙ্গে এক-দিন গিরিডি যাবো ঠিক করেছিলাম। এবার ঠিক হলো, আমরা নিজেরাই যাবো। অজিতদাও যেতে রাজি হয়েছেন, তার মানে রাণুদিও যাবেন।

রাত্তিরবেলা খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাবার পরও রাণুদি আর অজিতদা বাগানে হাত ধরে বেড়ান। আমি ছাদ থেকে দেখতে পাই,চাঁদের আলোয় ওদের সামান্য ছায়া পড়েছে, সেই ছায়া সঙ্গে নিয়ে ওঁরা আস্তে আস্তে হাঁটছেন। আমার একটুও ঈর্ষা হয় না। আমি রাণুদিকে ভালোবাসি। অজিতদার প্রতি আমি সাঙ্ঘাতিক কৃতজ্ঞ বোধ করি।

বড়মামা রাত্তিরের দিকে আজকাল আমাদের বাড়িতেই তাস খেলতে আসেন। ইচ্ছে করেই আসেন বোঝা যায়। খেলা ভাঙলে তিনি বাগানে দাঁড়িয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বলেন, রাণু, এবার বাড়ি চল মা, ঘুম পায় নি?

রাণুদি বলে, চলো বড়মামা, যাচ্ছি।

আজও তিনি অজিতদাকে ছাড়বেন না। অজিতদাও ওঁদের সঙ্গে রাণুদিদের বাড়িতে যাবেন। তারপর অজিতদা একটু ক্ষণ গল্প করবেন বড়মামার সঙ্গে। তারপর রাণুদি শুয়ে পড়লে, অজিতদা তাঁর ঘরে গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে মিষ্টি করে বলবেন, এবার ঘুমোও রানু। আমি আবার কাল সকালেই আসবো!

এর আগে, প্রত্যেক রাতে রাণুদিকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াতে হতো। এখন অজিতদার স্পর্শই রাণুদির ঘুমের ওষুধ।

অজিতদা দারুণ গল্প করতে পারেন। খুব জমিয়ে দিলে ট্রেনের কামরায়। অজিতদার শখ হচ্ছে খুঁজে খুঁজে নানা সাধু-সন্ন্যাসী বার করে তাঁদের সঙ্গে কথা বলা। এইজন্য তিনি হরিদ্বার লছমনঝোলা থেকে শুরু করে কাশী, উজ্জয়িনী এইসব জায়গাতেও ঘুরেছেন। কতরকম অভিজ্ঞতা। সেই সব গল্প শুনতে ট্রেনের পথটা যে কখন পার হয়ে গেল, খেয়ালই করিনি।

রাণুদির মাকেও আমরা সঙ্গে এনেছি। উনি অবশ্য আসতে চাইছিলেন না, আগে দু-তিনবার গিরিডি ঘুরেছেন, কিন্তু রাণুদিই জোর করে বলেছিলেন, চলো মা, চলো, চলো।

রাণুদি মাকে খুব ভালোবাসেন। তার এমন খুশীর সময় রাণুদি মাকেও ছাড়তে চান না। অজিতদাও বলেছেন হ্যাঁ, আপনিও চলুন, মাসিমা। সবাই যাচ্ছি, আপনি কেন একলা থাকবেন!

বড়মামা অবশ্য আসেনিন, তাঁর পুজো আছে। তিনি সতীশবাবুকে পাঠিয়েছেন সব কিছু ব্যবস্থা করবার জন্য। এই বেড়ানোটা আমাদের অন্যরকম হলো। অনেকটা যেন বাড়ি বাড়ি মতন, মা মাসি পিসিদের সঙ্গে।

গিরিডি থেকে উশ্রী ফলস দেখতে যাবার জন্য টাঙ্গা ভাড়া করা হলো তিনখানা। একটা টাঙ্গায় শুধু অজিতদা আর রাণুদি, ওদেরটাই চললো আগে আগে। যেন দুই দেশের কুমার ও ও রাজকুমারী, আমরা সবাই অনুচর। আমরা শুনলাম, ঐ টাঙ্গা থেকে গানের সুর ভেসে আসছে। আগে কক্ষোনো রানুদির গান শুনিনি।

ঝুমা বললো, দিদি এক সময় খুব ভালো গান গাইতো!

রাণুদির মা বললেন, কত বছর বাদে ও গাইছে বল তো? অন্তত তিন বছর না?

বলতে বলতেই ওঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এলো।

উশ্রী ফলসে গিয়ে রাণুদি আমাদের সঙ্গে কোরাসে গাইলেন অনেকগুলো গান। সব ব্যাপারেই রাণুদির দারুণ উৎসাহ। আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে হুটোপুটি দৌড়োদৌড়ি করছেন। প্রতিটি মুহূর্তেই যেন রাণুদিকে দেখে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে। এ এক অন্যরকম রাণুদি।

জায়গাটায় বেশ ভিড়। আমাদের রবিবারে বদলে অন্য কোনো একদিন আসা উচিত ছিল। কয়েকটা ছেলে জলপ্রপাতের ওপর থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছে নিচে। দেখলে ভয় করে। জল যেন টগবগ করে ফুটছে সেখানে, তবু তারই মধ্যে লাফিয়ে পড়ে ছেলেগুলো সাঁতার কেটে যাচ্ছে অবলীলাক্রমে। ইস, এখনো আমার সাঁতারটা শেখা হলো না!

রাণুদি অজিতদাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ওরকম পারবে?

অজিতদা হেসে বললেন, তা পারবো বোধহয়!

সঙ্গে সঙ্গে অজিতদা জামার বোতাম খুলতে লাগলেন। অজিতদা সুইমিং ট্রাঙ্ক পরেই এসেছিলেন, প্যান্ট আর শার্ট খুলে ফেলার পর তাঁর মেদহীন শরীরটা যেন ঝকঝক করে উঠলো। তিনি জলপ্রপাতের কাছে গিয়ে উঁচু করে দাঁড়ালেন।

তখন মত পাল্টে ফেললেন রাণুদি। তিনি এসে অজিতদার হাত ধরে বললেন না, তোমাকে লাফাতে হবে না, তুমি নিচে গিয়ে সাঁতার কাটো।

অজিতদা বললেন, তা কখনো হয়...তুমি বললে, এখন যদি না লাফাই, তুমি ভাববে, আমি পারবো না।

রাণুদি বললেন, না, আমি তা ভাববো না। আমি জানি, তুমি পারবে।

রাণুদির মা-ও এসে বললেন, না, না, এত উঁচু থেকে লাফাবার দরকার নেই বাপু। দেখলেই ভয় লাগে।

অজিতদা বললেন, কোনো ভয় নেই, মাসিমা। আমার অভ্যেস আছে।

রাণুদি চেঁচিয়ে উঠলেন, না।

তার আগেই অজিতদা লাফিয়ে পড়েছেন।

হ্যাঁ, নায়কদেরই এইরকম মানায়। অত ওপর থেকে ঠিক যেন পাখির মতন উড়ে অজিতদা গিয়ে পড়লেন নিচের উত্তাল জলের মধ্যে। কয়েক মুহূর্তের জন্য হারিয়ে গেলেন একেবারে, তারপরই মাথা ঝাঁকিয়ে তাকালেন ওপরে।

রাণুদির মুখখানা নিভে গিয়েছিল, আবার আলো জ্বলে উঠলো। রাণুদি তরতরিয়ে দৌড়ে চলে গেল নিচের দিকে।

ভাস্কর বললো, আমিও এখান থেকে লাফাতে পারি।

আশু ওপর কাঁধে হাত রেখে গম্ভীরভাবে বললো, না, দরকার নেই। চল, নিচে চল। ভাস্কর তবু লাফাতে চাইছিল, আশু ওকে টেনে নিয়ে গেল জোর করে।

আশু কেন ভাস্করকে বারণ করলো, তা বুঝতে আমার একটু অসুবিধে হলো না। এইমাত্র অজিতদা লাফিয়ে পড়ে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছে, এখন ভাস্করও সেইরকম লাফালে ঐ কৃতিত্বটা অনেকটা ম্লান হয়ে যাবে। আমার সন্দেহ হলো, আশুও বোধ হয় লাফাতে পারে।

ওরা সবাই চলে গেল নিচে স্নান করতে। অভিজিৎ আর সঞ্জয়কে পাহারা দেবার জন্য আমি থেকে গেলাম ওপরে। ঝুমাও সাতার জানে না, বেড়াতে এসেও সে সঙ্গে একটা বই এনেছে, একটা গাছে হেলান দিয়ে বই পড়তে লাগলো। আমি ওপর থেকে দেখতে লাগলাম ওদের সকলের জলখেলা। ঠিক সিনেমার মতন লাগে।

রাণুদির মা প্রচুর রুটি আর মাস আর সন্দেহ আর কমলালেবু এনেছেন। গোল হয়ে সবই মিলে বসে খেয়ে নিলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম, এত খাবার শেষ করা যাবে না, একটু পরেই মনে হলো আর কিছু থাকলে মন্দ হতো না।

টাঙ্গাওয়ালাদের আমরা দাঁড় করিয়ে রেখেছি। কিন্তু খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে যাওয়ার মানে হয় না, খানিকটা বেড়াতে হবে। অজিতদা একলা একলা একটু জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যেতেই রাণুদিও চলে গেলেন সেদিকে।

রাণুদির মা জিজ্ঞেস করলেন, ওরা কোথায় যাচ্ছে?

আমার মনে হলো, অজিতদা মাসিমার সামনে সিগারেট খেতে পারছেন না বলেই একটু আড়াল খুঁজছেন।

মাসিমা বললেন, তুমি একটু ওদের সঙ্গে যাও না নীলু।

আমার খুব অস্বস্তি হলো। এরকমভাবে যাওয়া যায়? মাসিমা কেন যেতে বলছেন, তাকি আর আমি বুঝি না। কিন্তু এরকম পাহারাদারের ভূমিকা আমার মোটেই পছন্দ হয় না। সঞ্জয় কিংবা অভিজিৎ গেলেই তো পারতো।

মাসিমার মুখের ওপর না-ও বলতে পারি না! মাসিমা চোখ দিয়ে আমায় অনুসরণ করছেন, অন্যদিকে যে কেটে পড়বো, তারও উপায় নেই। যেতে হলো ওদিকেই।

ও'রা তন্ময় হয়ে কথা বলছিলেন, তবু অজিতদা আমার পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন, পেছনে ফিরে বললেন, এসো নীলু একটু ঘুরে আসা যাক এদিকটা থেকে।

আমার দিকে সিগারেটের প্যাকেকটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি খাও নাকি?

আমি লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়ে বললাম, না, না।

রাণুদি বললেন, কতদিন পর বেড়াতে এলাম। মধুপুর আসার পরে থেকে একদিনও আমি কোথাও যাই না।

অজিতদা বললেন, এরপর একদিন আমরা ঝাঁঝা কিংবা শিশুলতলার ওদিকে যাবো। শিমুলতলাও খুব সুন্দর জায়গা।

আমরা যেদিকে এগোচ্ছি সেদিকটায় পাতলা জঙ্গল। মাটিতে কাচের মতন চকচকে কিছু জিনিস মাঝে মাঝে ছড়িয়ে আছে। আমি নিচু হয়ে কয়েকটা তুলে নিলাম। পাশগুলো চাকের মতন ধারালো নয়, চাপ দিয়ে মুড়মুড় করে ভেঙে যায়। অজিতদা বললেন, এগুলো অভ্র। গিরিডিতে অভ্রের খনি আছে।

আমি আগে কখনো অভ্র দেখিনি।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা বেশ খানিকটা দূরে চলে এসেছিলাম। রাণুদি অজিতদাকে জিজ্ঞেস করলেন, এবার ফিরবে না?

অজিতদা বললেন, আর একটু যাই। তোমার ভালো লাগছে না?

অজিতদা আমার হাতে একা গোপন চাপ দিলেন। ইঙ্গিতটা আমি বুঝে গেলাম। আমি বললাম, আমি এখানে একটু বসছি, খুব সুন্দর ছায়া। আপনারা ঘুরে আসুন। জায়গাটা সত্যি খুব সুন্দর। শুকনো পাতা খসে পড়ে তলাটা বেশ বিছানার মতন হয়ে গেছে। ইচ্ছে হয় শুয়ে পড়ি। কিন্তু হাত দিয়ে দেখলাম তলাটা ভিজে ভিজে, বোধহয় রাত্তিরেই এখানে বৃষ্টি হয়েছে। আমার আগেও এখানে কারা যেন এসে বসেছিল, অনেকগুলো সিগারেটের টুকরো, খালি প্যাকেট আর একটা কালো রঙের চুলের কাঁটা পড়ে আছে।

এর একটা মুহূর্ত যেন এক একটা ঘণ্টা! কত দূরে চলে গেলেন ওঁরা? আমি একলা একলাও ফিরতে পারি না। মাসিমা আমাকে প্রহরী হিসেবে পাঠিয়েছেন? অজিতদা আমার হাত টিপে আমাকে থেকে যেতে বললেন কেন? নিশ্চয়ই নিরালায় গিয়ে রাণুদিকে আদর করবেন।

এই কথাটা মনে আসা মাত্রই আমার শরীরে রোমাঞ্চ হলো। কান দুটো গরম গরম লাগলো। কী আদর করছ অজিতদা, কোথায় কোথায়? ওরা কি শুয়ে পড়েছে? আমাকে দেখতেই হবে।

অরণ্যচারী প্রাণীর মতন আমি নিঃশব্দে এগিয়ে চললাম। জুতো জোড়া খুলে রেখে গেলাম এক জায়গায়। মাঘ মাসের শীতের মতন আমি কাঁপছি। আমার শরীরে এখন উত্তেজনা।

খুব বেশী যেতে হলো না। রাণুদি একটা উজ্জ্বল লাল রঙের শাড়ি পরে এসেছেন, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সেই রং স্পষ্ট দেখা যায়। পা টিপে টিপে আমি চলে এলাম খুব কাছে।

না, ওরা মাটিতে শুয়ে পড়েনি।

খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে অজিতদা দুহাতে ধরে আছেন রাণুদির মুখখানা। দুজনের দৃষ্টি স্থির। তেমনভাবে আর কেউ তাকাতে পারবে না। যেনদুজনের চোখের মধ্যে তৈরি হয়েগেছে একটা অদৃশ্য সেতু। অজিতদা বললেন, একবার?

রাণুদি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমাকে কোনো দিন ছেড়ে যাবে না, বলো।

অজিতদা বললেন, কোনোদিন না। তুমিও আমায় ছেড়ে যাবে না তো রাণু?

—না, না, না—

অজিতদা রাণুদিকে বুকে টেনে নিয়ে রাণুদির ঠোঁটে ঠোঁট ডোবালেন।

আমি সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে ফেললাম।

অজিতদা নয়, আমিই রাণুদিকে চুমো খাচ্ছি। একবার নয়, অনেক বার।

॥৮॥

সকালবেলা রাণুদি এসে বসে আছেন আমাদের বাড়িতে। অজিতদা তখনো আসেন নি।

সকালবেলায় চা-টা আজকাল সবাই আমাদের বাড়িতেই খায়। আমাদের খাওয়া-দাওয়ার মোটামুটি একটা যৌথ ব্যবস্থা হয়ে গেছে। চায়ের পর ন'টা সাড়ে নটার সময় জলখাবার আসে রাণুদিদের বাড়ি থেকে। দুপুরে খাওয়াও বলতে গেলে প্রায়দিনই রাণুদিদের বাড়িতে, দু-এক দিন অবশ্য আমাদের বাড়িতেও সবাই মিলে রান্না করি। অজিতদামুর্গী কিনে আনেন। নিজেই তিনি মুর্গী ছাড়ান এবং রান্না করেন। বেশ ভালো রান্নার হাত অজিতদার।

পরী এসে চা দিয়েগেল। একটা ট্রেতে করে খালি কাপ বড় টি-পট বেশ যত্ন করে সাজিয়েও আনে। আজ কাল আর পরী রাত্তিরের দিকে মহুয়ার নেশা করে হল্লা করে না, সন্ধের পরই ও কোথায় যেন চলে যায়, কখন ফেরে টের পাই না। সকালবেলায় ও শান্তশিষ্ট ভালোমানুষ।

আশু পট থেকে চা ঢালছিল, আমি রাণুদির মুখের দিকে চেয়ে বললাম, অজিতদা তো এখনো এলেন না।

রাণুদি বললেন, ঘুম থেকে ওঠেনি বোধহয়।

—চা যে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে!

রাণুদি সঞ্জয়কে বললেন, এই টুকুন, তুই ডেকে নিয়ে আয় না!

সঞ্জয় ক'দিন ধরেই উৎপলের কাছে কাছে দারুণ উৎসাহে তাসের ম্যাজিক শিখছে। সে এখন যেতে চায় না। সে বললো, দাঁড়াও না, বাবা, আসবে।

ভাস্কর বললো, অজিতদা এলে আবার এক রাউণ্ড চা খাওয়া যাবে। এটা শেষ করে ফেলা যাক।

ন'টা বেজে গেল, তখনো অজিতদা এলেন না।

এরকম তো হয় না। এখানে বেশী বেলা পর্যন্ত কেউই ঘুমোয়না। ভোর হতে না হতেই জানলা দিয়ে চোখে এসে আলো পড়ে, আর কতরকম পাখির ডাক। চোখ মেলার পরই মনে হয়, আঃ কী সুন্দর দিনটা। আমরা তো রাত্তির বারোটা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে আবার ছটা বাজতে না বাজতেই উঠে পড়ি।

আমাদের খাবার ঘরের একপাশে একটা পুরোনো আমলের ইজিচেয়ার আছে। আগে আমাদের চারজনের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা ছিল, কে প্রথমে দৌড়ে এসে চেয়ারটা দখল করবে। এখন অবশ্য সেই ইজিচেয়াটা রাণুদির জন্যই রিজার্ভ করা। রাণুদি পা মুড়ে বসতে ভালোবাসেন।

আমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে ছিলাম বলে সময়টা খেয়াল করিনি। কিন্তু রাণুদি একেবারে চুপ করে বসে আছেন। মুখ দেখলেই বোঝা যায় মনটা খারাপ হয়ে গেছে। রাণুদির মন খারাপ আমার একদম সহ্য হয় না।

আমি পাজামা আর গেঞ্জি পরে ছিলাম, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, প্যান্টটা পরে আসি, অজিতদাকে ধরে আনতে হবে।

ভাস্কর বললো, যা পরে আছিস, ঐ পরেই যা না। এখানে তোকে আর কে দেখছে?

কে একজন ঐটুকু বললেই হলো। সত্যি তো, পাজামা গেঞ্জি পড়ে এখানে রাআয় বেরোলে ক্ষতি কী? এ তো আর শহর নয়। সঞ্জয়কে বললাম, এই, তোর সাইকেলটা আনিস নি?

রাণুদি বললেন, চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

কর্তব্যপরায়ণ ভাইয়ের মতন সঞ্জয় আর অভিজিৎ তাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো। তখন আমি বললাম, চল্ না, আমরা সবাই মিলে ঘুরে আসি। খানিকটা হাঁটাও হবে।

আশু আর উৎপল আলস্য করে রয়ে গেল। বাকি আমরা সবাই বেরিয়ে পড়লাম। গেটের মুখেই দেখা হলো ঝুমার সঙ্গে। ভাস্কর তাকে বললো, চলো, আমরা নদীর ধারটায় যাচ্ছি। তুমি যাবে?

ঝুমার সঙ্গে ভাস্করের বেশ জমে গেছে। প্রায়ই ওরা আলাদা কথা বলে। রাত্তিরবেলা শুয়ে শুয়ে এই নিয়ে আমরা তিনজন ভাস্করকে খুব প্যাঁক দেই। তবে আমি যে রাণুদিকে কতটা ভালোবাসি, সে কথা আর কেউ জানে না। রাণুদিও কি জানে?

অজিতদার বাড়ি খুব কাছে নয় অন্তত পৌনে এক মাইল হবেই। তবে এই সব ফাঁকা জায়গায় দূরকে দূর বলে মনে হয়না।

বাড়ি থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। বাবা একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলে মা আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরে যাবার জন্য লিখেছেন। অথচ ভাস্কররা আরও কয়েকদিন থেকে যেতে চায়। আমাকে হয়তো একলাই ফিরে যেতে হবে। এইসব ছেড়ে ফিরে যাওয়া যায়? এই ক'দিন তো ভুলেই গিয়েছিলাম যে কলকাতায় আমার বাবা, মা, কলেজ, কফি হাউস এসব আছে। বাবার অসুখ করলে আমিই বা কী করবো, দাদারাই তো রয়েছে। তবু জানি, মা লিখেছেন যখন, তখন যেতেই হবে, না এলে বাবা দারুণ রাগারাগি করবেন।

অজিতদার বাড়ির কাছাকাছি এসে রাণুদি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, আমি জানি, ও বাড়ি নেই।

আমারও সেই কথা মনে হচ্ছিল। ক'দিন ধরেই অজিতদা বলছিলেন, আমাকে একবার জসিডি যেতে হবে, কয়েকটা কাজ আছে। রাণুদি যেতে দিচ্ছিলেন না। অজিতদা প্রায়ই জসিডি যান।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি করে জানলেন? আপনাকে কাল কিছু বলে গেছেন?

—না। তবু আমার মনে হচ্ছে।

আমার মনে হচ্ছে বাড়িতে হয়তো মিস্তিরি-টিস্তিরি এসেছে।

—না দেখো, ও বাড়িতে নেই।

ভাস্কর গেট দিয়ে ঢুকলো না। সে বললো, তোরা অজিতদাকে ডাক, আমি একটু ঝুমাকে নিয়ে নদীর ধারটা ঘুরে আসছি।

আমি মনে মনে বললাম, ঐ নদীটা আমার। কিন্তু আজকের জন্য ভাস্ক আর ঝুমাকে আমি আমার নদীটা দিয়ে দিলাম। ইচ্ছে করলে, ভাস্কর, তুই আমার গাছ থেকে কদমফুল পেড়ে ঝুমাকে দিতে পারিস।

অজিতদা সত্যি বাড়ি নেই।

বাগানে একজন মালি কাজ করছিল, সে বললো, বাবু তো বাহার গিয়া—

—কখন?

—বহুত সুবা মে।

আমি রাণুদিকে বললাম, অজিতদা নিশ্চয়ই কোনা কাজে বেরিয়ে গেছেন, অত সকালে আমাদের বাড়িতে গিয়ে দেখেছেন, আমরা কেউ ঘুম থেকে উঠিনি, তাই খবর দিতে পারেনি।

রাণুদি আমার দিকে চেয়ে রইলেন একদৃষ্টে।

মালিকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কাঁহা গিয়া কুছ বোলা?

সে জানালো যে সে বিষয়ে সে কিছু জানে না। লোকটি একটু গম্ভীর ধরনের,বেশী কথা পছন্দ করে না।

পাহাড়গুলোর কাছে সাধুবাবার ডেরায় অজিতদার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল, অজিতদা বলেছিলেন, উনি প্রায়ই ঐ সাধুর কাছে যান। আজও সেখানে যাননি তো? আমরা পরে অজিতদাকে অনেকবার সেই সোনা তৈরির ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করেছি। অজিতদা বলেছিলেন, কিছুতেই শেখাতে চাইছে না আমাকে, কিন্তু সাধুটি সত্যিই জানে। সাধু সন্ন্যাসীর ওপর অজিতদার খুব বিশ্বাস।

রাণুদি একটা পাহাড়ের ওপর উঠতে চেয়েছিলেন। অজিতদার খোঁজে আজই রাণুদিকে ঐ পাহাড়ে নিয়ে গেলে হয়। আমি এক্ষুনি রাজী আছি।

কিন্তু আগে রাণুদির মা আর বড়মামার অনুমতি নিতে হবে। তাছাড়া অতদূরের রাস্তা, এতখানি কি রাণুদিকে হাঁটানো উচিত? অজিতদা সঙ্গে থাকলেও না হয় কথা ছিল।

নদীর ধারে ভাস্করকে ঝুমার সঙ্গে নির্জনে বেড়ানোর সুযোগ দেওয়া গেল না। অভিজিৎ আর সঞ্জয় সেদিকে দৌড়ে গেল।

আমিও রাণুদিকে বললাম, একটু ওখানে গিয়ে বসবেন।

রাণুদি বললেন, না, ভালো লাগছে না।

আমরা ফিরে চললাম। রাণুদি আর আমাদের বাড়িতে ঢুকলেন না, চলে গেলেন নিজেদের বাড়িতে। আমি ক্ষীণভাবে বলবার চেষ্টা করলাম, দেখুন, একটু বাদেই নিশ্চয়ই অজিতদা এসে যাবেন। রাণুদি সে কথার কোনো মূল্য দেননি।

দুপুরের মধ্যেও অজিতদার পাত্তা পাওয়া গেল না। দুপুরে ও বাড়িতেই খাওয়ার জন্য বড়মামা আমাদের ডেকে পাঠালেন। রাণুদি নিজের ঘরে শুয়ে আছেন। একবারও এলেন না আমাদের সঙ্গে কথা বলতে।

বড়মামা আর রাণুদির মায়ের মুখে চিন্তার রেখা পড়েছে।

রাণুদির মা একবার বললেন, একটা কিছু খবর দিয়ে গেল না কেন?

বড়মামা বললেন, নিশ্চয়ই কোনো কাজে গেছে। আগে থেকে বললে রাণু কি ওকে যেতে দিত? রাণু যে ওকে সর্বক্ষণ আঁকড়ে থাকতে চায়।

মাসীমা বললেন, রাণু আগেও কয়েকটি ছেলে-টেলেদের সঙ্গে মিশেছে। আমি কোনোদিন ওতে বাধা দিইনি। কিন্তু রাণুর এরকম অবস্থা তো আগে কখনো হয়নি?

বড়মামা বললেন, আগেকার অবস্থা আর এখনকার অবস্থা তো এক নয়। এ ছেলেটিকে তো আমার বেশ ভালোই মনে হয়।

মাসীমা বললেন, কিন্তু হঠাৎ যদি চলে যায়।

টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েগেছে, তবু আমি বললাম, আমি একবার চট করে ঘুরে আসছি।

সাইকেলটা নিয়ে তক্ষুনি বেড়িয়ে পড়লাম। সকালবেলা অজিতদার বাড়ির মালিকে একটা জরুরী কথাই জিজ্ঞেস করা হয়নি। অজিতদা কোনো মালপত্র নিয়ে গেছেন কি না। এমনি খালি হাতে গেলে তো কখনো না কখনো ফিরে আসবেনই। অবশ্য অজিতদা সম্পর্কে এরকম সন্দেহ করার কোনো মানে হয় না। হঠাৎ মালপত্র নিয়ে আমাদের কিছু না বলে উনি উধাও হয়ে যাবেনই বা কেন? উনি যেতে চাইলে তো ওঁকে কেউ জোর করে আটকে রাখতো না। তাছাড়া রাণুদিকে উনি কথা দিয়েছেন, আমি নিজের কানে শুনেছি।

বাগানের গেটটায় তালাবদ্ধ।

মালি, মালি বলে কয়েকবার চেঁচিয়ে ডাকলাম। কোনো সাড়া নেই।

সাইকেলটাকে দেয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে রেখে, কাঠের গেটটা বেয়ে উঠে টপকে নামলাম ওদিকে। খুবই সোজা ব্যাপার। মালির ঘরটাও বন্ধ। সে কোথায় গেছে কে জানে! আমাদের বাড়ির মালির মতন এ বাড়ির মালি বৌ-ছেলে নিয়ে থাকে না। অজিতদার ঘরেও তালা ঝুলছে। তবু দরজাটা একটু ফাঁক করে ভেতরটা দেখবার চেষ্টা করলাম। ভিতরটা অন্ধকার, আলো দেখা যায় না, তবু মনে হলো ভেতরে জিনিসপত্র কিছু রয়েছে।

আমাকে এই অবস্থায় কেউ দেখলে নির্ঘাত চোর ভাববে। আর চোরের মতন যখন ঢুকেছিই তখন দু'একটা জিনিস চুরি না করারও কোনো মানে হয়। এ বাড়িতে দু'তিনটে গন্ধ লেবুর গাছ রয়েছে। কয়েকটা লেবু ছিঁড়ে পকেটে ভরে নিয়ে আবার গেট পেরিয়ে চলে এলাম বাইরে।

বিকেলের দিকে রাণুদির মনে আবার প্রতিক্রিয়া শুরু হলো। আমরা সবাই এই ভয়ই পাচ্ছিলাম।

আমরা বসেছিলাম কালী মন্দিরের সামনের চাতালে। মাসীমা ফলটল কাটছেন বড়মামা পুজোয় এক্ষুনি বসবেন। হঠাৎ বাড়ির মধ্য থেকে ছুটে বেরিয়ে রাণুদি চলে গেলেন গেটের দিকে। আমরাও সবাই পেছন পেছন দৌড়োলাম।

গেটটা খোলার আগেই ধরে ফেললাম রাণুদিকে।

ভাস্কর জিজ্ঞেস করলো, রাণুদি কোথায় যাচ্ছেন?

রাণুদি বললেন, জানি না। ছাড়ো আমাকে।

আমি বললাম, রাণুদি অজিতদা খবর পাঠিয়েছেন, একটু বাদেই আসবেন।

রাণুদি ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, অজিতদা? অজিতদা কে?

—আমাদের অজিতদা! সত্যি খবর পাঠিয়েছেন।

—আমার একটা জিনিস হারিয়ে গেছে। আমি খুঁজতে যাচ্ছি।

বড়মামা এসে পড়ে বললেন, রাণু, কোথায় যাচ্ছিস মা? আমি পুজোয় বসবো এখন পুজো দেখবি না?

রাণুদি বললেন, আমার একটা জিনিস হারিয়ে গেছে। আমার কী হারিয়েছে তোমরা বলতে পারো। আমার মনে পড়ছে না?

বড়মামা এক গাল হেসে বললেন, ওমা, দেখো মেয়ের কাণ্ড! এক কানে দুল পরেছিস, আর একটা কোথায় গেল? কোথায় হারালি? বাড়ির মধ্যেই কোথাও পড়েছে দ্যাখ।

সত্যিই রাণুদির এক কানে দুল নেই। আমরা আগে লক্ষ্য করিনি।

রাণুদি বললেন, দুল? আমি দুল হারিয়েছি? না তো?

বড়মামা রাণুদির হাত ধরে সেই হাতটা ওঁর দুলহীন কানে ছুঁইয়ে বললেন, এই বালিশের পাশে—

এতে বেশ কাজ হলো। রাণুদির চোখ অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে গেল যেন, আপন মনে বললেন, ও, দুল নেই, তাহলে বিছানায় বালিশের পাশে—

রাণুদি আমাদের সঙ্গে ফিরে এলেন। সঞ্জয় দৌড়ে গিয়ে রাণুদির দুলটা খুঁজে নিয়ে এলো। রাণুদি সেটা পরে নিয়ে বললেন হ্যাঁ, আমি পুজো দেখবো। আমি এইখানে বসবো?

খুব কাতর গলায় রাণুদি বড়মামাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি দৌড়ে গিয়েছিলুম বলে আমায় কেউ বকবে না তো?

দু'তিনজনে মিলে একসঙ্গে বলে উঠলো, না, না, কেউ বকবে না। বকবে কেন?

আমার খুব রাগ হলো অজিতদার ওপর। এরকম একটি মেয়েকে ছেড়ে কেউ চলে যায়? অজিতদার কি হৃদয় নেই?

আমরা সবাই সতর্ক, আমরা সবাই পাহারাদার। রাণুদি কখন কী করে বসবেন কোনো ঠিক নেই।

রাণুদি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর একসময় আমার দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, এই তুমি আমার নাম জানো?

আমি বললাম, হ্যাঁ! আপনি তো রাণুদি!

—না, আমার আর একটা নাম আছে না? কী আমার ভালো নাম বলো তো?

—মাধুরী!

—হ্যাঁ, মাধুরী। তুমি ঠিক বলেছো। তুমি সব জানোঃ আচ্ছা বলো তো, আমার কী হারিয়ে গেছে?

—ঐ দেখুন রাণুদি, বড়মামা পুজো করছেন।

রাণুদি উঠে দাঁড়িয়ে খানিকটা আচ্ছন্নর মতন চলতে চলতে কলী প্রতিমার কাছে গিয়ে বললেন, আমি পুজো করবো?

কালী প্রতিমার পাশে রাণুদিকে দারুণ সুন্দর দেখালো। রাণুদিও কক্ষনো চুল বাঁধেন না, মস্তবড় চুল পিঠের ওপর ছড়ানো, মুখখানা চকচক করছে, আমি যেন একমুহূর্তের জন্য রাণুদিকেও নগ্ন দেখলাম। ঠাস করে আমার নিজের গালে চড় মারবার ইচ্ছে হলো। আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম অন্যদিকে।

বড়মামা মন্ত্র পড়া থামিয়ে রাণুদির দিকে ঝুঁকে তাঁর হাত ধরে বললেন হ্যাঁ, রাণু, পুজো করবে। তুমি বসো আমার পাশে।

রাণুদি বললেন, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুজো করবো না? আমায় ফুল দাও।

মাসীমা বললেন, রাণু, লক্ষ্মীটি এদিকে সরে এসো। ঠাকুরের গায়ে হাত দিতে নেই।

বড়মামা বললেন, দিক। ওর যা ইচ্ছে করুক।

রাণুদি কালীঠাকুরের গলা থেকে জবা ফুলের মালাটা ছিঁড়ে নিলেন। তারপর প্রতিমার বিশাল স্তনের ওপর হাত রেখে বললেন, আঃ কী ঠাণ্ডা!

মাসীমা চোখ বুজে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, না, না, পাপ হবে পাপ হবে। কেউ ওকে ওখান থেকে ধরে নিয়ে এসো।

আমি তড়াক করে উঠে গিয়ে রাণুদির হাত ছুঁয়ে বললাম, চলুন রাণুদি, বেড়াতে যাবেন?

রাণুদি জবাফুলের মালাটা চাবুকের মতন ধরে সপাং করে মারলেন কালীমূর্তির মুখে।

এতটা বাড়াবাড়ি রাণুদি আগে কক্ষনো করেন নি। বড়মামাও উঠে দাঁড়িয়ে রাণুদিকে টেনে সরিয়ে আনলেন সেখান থেকে। মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, ছিঃ রাণু, ওরকম করতে আছে? সবাই দেখছে।

রাণুদি বললেন, ও তো পাথর, ওর তো লাগে না।

বড়মামা বললেন, হোক পাথর, তবু আমরা পুজো করি তো। যাঁকে আমরা পজো করি, তাঁকে কক্ষনো অপমান করতে নেই।

—ওর কি কোনো জিনিস হারিয়েছে? তুমি বলো, বড়মামা, কালীঠাকুরের কোনো জিনিস হারায়?

—না, ওঁর হারায় না। উনি সবাইকে দ্যান। তোমাকেও দেবেন।

—মিথ্যুক কোথাকার।

—যাও রাণু এখন গিয়ে শুয়ে থাকো। পুজোটা সেরে নিই, তারপর তোমায় ইঞ্জেকশান দেবো।

—আমি শোবো না। আমি বসবো।

অজিতদা নেই, আমিই যেন অজিতদা। আমি সাহস করে রাণুদির হাত ধরে বললাম, চলুন রাণুদি, আমরা বাগানের ঐ বেঞ্চটায় বসি।

আপত্তি না করে আমার সঙ্গে চলে এলেন রাণুদি। বেঞ্চটায় বসে গভীর বিস্ময়ভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এটা কি সেই নদীর ধারের পাথর? তুমি জানো, এটা সেই পাথর?

—না, পাথর কেন হবে। এটা বেঞ্চ। আপনাদেরই বাড়িতে।

—তা হলে আজ আমি পাগল হইনি, না?

—না!

—তাই তো বলছি, আমি পাগল হইনি। আমি ভালো আছি। অথচ আমি ভাবছিলাম ঝড় হচ্ছে। সত্যিসত্যি ঝড় হচ্ছে না?

—হ্যাঁ, হয়েছে একটু আগে।

—তুমি বেশ সব জানো।

—রাণুদি, আমি আপনাকে ভীষণ ভালোবাসি।

রাণুদি খিলখিল করে হেসে উঠে বললেন, আর একটা কথা মনে পড়েছে। আমার একটা পোষা বেড়াল ছিল, খুব ভালোবাসতাম তাকে। দ্যাখো, এই কথাটাই ভুলে গিয়েছিলাম। এখন মনে পড়েছে, তাহলে আমি পাগল হইনি, পাগল হলে তো কিছু মনে থাকে না।

রাণুদি অজিতদার কথা এবারও বলছে না। অজিতদাকে ভুলে গেছেন হয়তো। এই বিস্মরণের মূল্য কী সাঙ্ঘাতিক!

রাণুদির মুখখানা ফুরফুরে হাসি মাখানো। যেন ভেতরে ভেতরে কিছু একটা নিয়ে মজা করছেন। এমনও মনে হতে পারে, যেন সবটাই ওঁর অভিনয়। শুধু কালী প্রতিমাকে ফুলের মালার চাবুক মারার সময় মুখখানা যেমন অদ্ভুত হয়ে গিয়েছিল, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীও সেরকম মুখের ভাব ফোটাতে পারবেন কি না সন্দেহ।

রাণুদি বললেন, আমার আরও একটা কথা মনে পড়ে গেছে, আমি যখন জাপান গিয়েছিলাম....আমি জাপান গিয়েছিলাম তুমি জানো তো, সে অনেক দিন আগে, কত বেড়ালাম, কত জায়গা দেখলাম....কিন্তু সেই জাপানে গিয়েও আমার অনেকগুলো জিনিস হারিয়ে গেল।

আমি চুপ করে রইলাম। পরে শুনেছিলাম, রাণুদি কখনো জাপানে যাননি। অথচ কী বিশ্বাসযোগ্যভাবে কথাগুলো বলছিলেন। কেন মাথায় হঠাৎ জাপান এলো, কে জানে।

—তুমি জাপানে গিয়েছো?

—না, যাইনি।

—আমি তোমায় নিয়ে যাবো। আমি সব চিনি, রাস্তা-টাস্তা সব, তবে, ওখানে বড্ড জিনিস হারিয়ে যায়....আমার কী কী হারিয়ে গেছে ঠিক মনে নেই....শুধু জাপানে কেন, আমি যেখানেই যাই, অনেক জিনিস হারিয়ে যায়। তোমার কিছু হারিয়ে যায়?

—হ্যাঁ, যায় মাঝে মাঝে।

—আমি যখন ইস্কুলে পড়তাম, তখন কিন্তু আমার কিছু হারাতো না, হ্যাঁ, সত্যি বলছি, কোনোদিন কিছু হারায়নি, তখন জিনিসগুলো খুব হালকা হালকা ছিল তো, খুব হালকা।

কথা বলতে বলতেই রাণুদি উঠে দাঁড়ালেন।

আমি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছেন!

—বাঃ যাবো না? সেই যে,যেগুলো হারিয়ে গেছে, খুঁজবো না?

রাণুদিকে উঠে দাঁড়াতে দেখে ভাস্কররা এগিয়ে এলো ওদিকে। ওরা ঠিক নজর রেখেছে। রাণুদি হঠাৎ দৌর মারলে সবাই মিলে ধরে ফেলতে হবে।

তাহলে কি রাণুদিকে এখন থেকে ঘরে আটকে রাখতে হবে? অজিতদাই এ জন্য দায়ী।

পুজো শেষ হয়ে গেছে, বড়মামা ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জটা হাতে নিয়ে এলেন। রাণুদি আগে ইঞ্জেকশান নিতে একটুও আপত্তি করতেন না। আজ বড়মামাকে দেখেই রীতিমতন চিৎকার করে বললেন, না।

তারপর দৌড় লাগালানে। সে এক রীতিমতন চোর চোর খেলার মতন শুরু হলো। আমরা সবাই মিলে নানাদিক থেকে ছুটতে লাগলাম রাণুদিকে ঘিরে। রাণুদি মাথা নিচু করে তীব্র বেগে হঠাৎ ঘুরে যাচ্ছেন। এমনিতে এখনো হাসছেন রাণুদি, কিন্তু আমরা কেউ ওঁকে একবার ধরে ফেললেই উনি কেঁদে কেঁদে চেঁচিয়ে উঠছেন, না, না আমায় ছেড়ে দাও আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। আমরা ওঁকে ধরে রাখতে পারছি না।

একবার রাণুদি আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন, খুব জোরে। আবার উঠে পড়বার আগে আমরা সবাই গোল হয়ে ওঁকে ঘিরে দাঁড়ালাম।

বড়মামা নরম গলায় বললেন, লেগেছে, রাণু?

রাণুদি দুহাতে কান চাপা দিয়ে বললেন, আমি কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না। তোমরা আমায় কিচ্ছু বলো না।

কী করুণভাবে রাণুদির সেই মাটিতে বসে থাকা। আমরা কেউ ওঁকে ধরে তোলবারও চেষ্টা করলাম না।

—তোরা আমায় মারবে? আমি কি পাগল হয়ে গেছি? আজ তো আমি পাগল হইনি? আমি আজ ভালো আছি।

বড়মামা বললেন, না, না রাণু, তোমায় মারবো কেন? তুমি ওঠো, চলো, বাড়ির ভিতরে চলো।

—আমায় নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দেবে? দিও না! আমাকে ভীষণ ব্যথা দেয়, আমার খুব একলা একলা লাগে।

—না, নার্সিংহোমেও পাঠাবো না। তুমি বাড়িতেই থাকবে। ইঞ্জেকশানটা দিয়েনি? ঘুমিয়ে পড়লেই ভালো লাগবে।

—না! আমার ভালো লাগার দরকার নেই।

রাণুদি আবার উঠে দাঁড়াতেই দু' তিনজন ওঁকে চেপে ধরলো। আমি অবশ্য গেলাম না। রাণুদি কষ্ট পাচ্ছেন, আমি আর দেখতে পারছি না।

বড়মামা ভাস্করদের বললেন, রাণুদির হাত শক্ত করে ধরে থাকতে। তারপর তিনি ইঞ্জেকশানের সূচটা ফুটিয়ে দিলেন।

ঠিক তখনই ক্যাঁচ করে শব্দ হলো বাগানের গেটে। সেখানে দেখা গেল অজিতদার লম্বা চেহারাটা।

তক্ষুনি আমার মনে হলো, অজিতদার অন্তত আর এক মিনিট আগে আসা উচিত ছিল। সেটাই হতো ঠিক নাটকীয় মুহূর্ত।

অজিতদা প্রায় দৌড়ে এসে উপস্থিত হলেন, আর আমাদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন কী হয়েছে রাণু? কী হয়েছে?

রাণুদি মুখটা তুলে অকৃত্রিমভাবে অবাক হয়ে বললেন, ইনি কে? ইনি কি সত্যময়ের ভাই?

অজিতদা বললেন, আমি এসেছি, রাণু, আমি। আমার দিকে তাকাও!

রাণুদি তাকালেন, কিন্তু দৃষ্টিতে কোনো পরিচয় প্রকাশ পেল না। ফিসফিস করে কী বললেন, বুঝতে পারলাম না আমরা।

অজিতদা ভাস্করদের বললেন, তোমরা ওর হাত ধরে আছো কেন? ছেড়ে দাও, ও এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে।

তারপর বড়মামার দিকে ফিরে বললেন, কাল অনেক রাত্তিরে আমার বাড়িতে একটা আর্জেন্ট টেলিগ্রাম এসেছিল, দিল্লি থেকে। অফিসের একটা জরুরী ফাইল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তাই জামাইবাবু আমায় ফিরে যেতে বলেছেন। আজ সকালেই টেলিগ্রামের একটা উত্তর দেওয়া দরকার....এখানে,মধুপুরের পোস্ট অফিসে টেলিগ্রাফ যন্ত্রটা খারাপ, তাই জসিডি যেতে হয়েছিল।

আমি একটু ক্ষুণ্ণভাবে বললাম, জসিডি থেকে আসতে এত সময় লাগলো?

অজিতদা আমাকে একটু ছোট বকুনি দিয়ে বললেন জসিডিতে আমার জন্য দু—একটা কাজও ছিল।

রাণুদি এবার একটু জোরে বললেন, জাপানে...একটা জঙ্গলের মধ্যে...আমার অনেক কিছু হারিয়ে গেছে...কেউ জানে না!

অজিতদা বললেন, আমি একটু রাণুর সঙ্গে একলা কথা বলতে চাই।

বড়মামা বললেন, কিন্তু ও তো এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়বে, ইঞ্জেকশান দিলাম যে, ঐ যে দ্যোখো না চোখ বুজে আসছে।

রাণুদি টেনে টেনে সুর করে বললেন, তা-র-প-র খুব-বৃষ্টি-প-ড়-লো! ক-ত জল! ঢেউ-এর প-র ঢেউ! খালি ঢেউ..উঁচু উঁচু, ঠিক যেন মা-নু-ষে-র মতন এক একটা ঢেউ, জ্যা-ন্ত! হ্যাঁ।

অজিতদা বললেন, তাহলে এখনই একটা দরকারি কথা বলি। রাণু, তুমিও একটু মন দিয়ে শোনো। আমাকে শিগগিরই দিল্লি ফিরে যেতে হবে, আমি রাণুকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। রাণুর বাবা কবে আসবেন?

বড়মামা কোনো ব্যাপারেই সহজে অবাক হন না। তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, এই শনিবারেই তো আসবার কথা।

অজিতদা বললেন, তারও তো আর চারদিন বাকি। আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে, আমি রাণুকে বিয়ে করতে চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি রাণুকে সারিয়ে তুলতে পারবো। অবশ্য, রাণুর মতামতটাও জানতে হবে। ও যদি রাজি থাকে।

রাণুদি এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কিছুই বুঝলেন না বা শুনলেন না। তিনি তখন অভিজিতের কাঁধে ভর দিয়ে ঢুলছেন।

॥৯॥

পরদিন দুপুর পর্যন্ত রাণুদি ঘুমিয়েই কাটালেন। এরমধ্যে তাঁকে কিছু খাওয়ানো যায় না। বিকেলের দিকে জেগে উঠেও রাণুদি চিনতে পারলেন না অজিতদাকে। তখন তাঁর সেই একদম চুপচাপ থাকার অবস্থা, কেউ হাজারটা কথা বললেও উত্তর দেবেন না।

তবে, অসীম ধৈর্য অজিতদার। রাণুদি জেগে ওঠার পর তিনি সর্বক্ষণ বসে রইলেন রাণুদির কাছে। রাণুদি প্রগাঢ় স্তব্ধতা ভাঙবার জন্য তিনি একাই কথা বলে যেতে লাগলেন অনর্গল।

আমাদের সবারই মন ভার হয়ে আছে। সবাই ঠিক একটা কথাই ভাবছি, রাণুদি কি আগের অবস্থায় ফিরে আসবেন? অথবা, হঠাৎ অজিতদার কাছ থেকে আঘাত পেয়ে মনটা একেবারে বিকল হয়ে গেছে। যদিও অজিতদার খুব বেশী দোষ নেই, মাত্র একটা দিন সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ছিলেন। মানুষের তো এরকম কাজ থাকতেই পারে। অজিতদা কোনো খবর দিয়ে যান নি রাণুদিকে। সেটা ওঁর বোঝার ভুল। উনি ভেবেছিলেন, খবর দিতে এলে রাণুদি ওঁকে ছাড়বেন না। আর আমাদের কাছে কোনো খবর দিয়েও বোধহয় কোনো লাভ হতো না, রাণুদি আমাদের কথা বিশ্বাস না করতেও পারতেন। তা হলেও এই একই অবস্থা হতো। ফেরার পর থেকে অজিতদা যে-রকম যত্ন করেছেন, তাতে আমরা ওকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

সারাদিন আমাদের কোনো খেলা-টেলা জমলো না। আমরা একবারও চেঁচিয়ে কথা বলিনি বা হাসি-ঠাট্টা করিনি।

সন্ধের পর অনেকক্ষণ আমরা রাণুদিদের বাড়িতেই কাটালাম। বড়মামাও আজ বেশ গম্ভীর। নিয়মমতন পুজো করলেন ঠিকই, তারপর আমাদের পাশে বসে একটার পর একটা সিগারেট টানতে লাগলেন, চোখ দুটো উদাস। এই বংশে আগে একজন পাগল হয়ে গিয়েছিল বলে রাণুদিকেও সেই রোগে ধরলো। সম্পূর্ণ বিনা দোষে।

বড়মামা এক সময় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তোমরা কিন্তু আজ এখানে খেয়ে যাবে।

আমরা একবাক্যে না, না, বলে উঠলাম। এ বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া মানেই একটা দারুণ হৈ-চৈ-এর ব্যাপার। বিশেষ যে-কদিন রাণুদি ভালো ছিলেন, ওঁর উপস্থিতিই

আমাদের অন্তত আমাকে তো খুব বেশী আকৃষ্ট করতো। আজ এই নিরানন্দ পরিবেশে আমাদের একেবারেই খেতে ইচ্ছে করবে না।

আমাদের বাড়িতে রান্না হয়ে গেছে বলে আমরা উঠে পড়লাম। অজিতদার কাছ থেকেও বিদায় নিলাম না, অজিতদা রাণুদির ঘরে রয়েছেন, এখন আর ডিসটার্ব করার দরকার নেই।

মাঠ ভেঙে ফেরার পথে উৎপল বললো, রাণুদিকে পাগল জেনেও অজিতদা বিয়ে করতে চাইছেন, অজিতদার সত্যি দারুণ সাহস। আর পাগল মানে তো আর একটু-আধটু পাগল নয়।

ভাস্কর বললো, এ বিয়ে হবে কি না খুব সন্দেহ হচ্ছে।

—কেন?

—রাণুদির মা রাজি নন। বড়মামা আমাকে বলেছেন। মাসিমা বলছেন, দিল্লি, ঐ অতদূরে রাণুদিকে পাঠিয়ে তিনি শান্তিতে থাকতে পারবেন না। তিনি রাণুদিকে নিজের চোখের কাছে রাখতে চান। অজিতদা কলকাতার ছেলে হলে কোনো আপত্তি ছিল না।

—অজিতদা ট্রান্সফার নিতে পারেন না?

—ট্রান্সফার নেওয়া কি অত সোজা? অজিতদা অবশ্য বলেছেন, উনি খুবই চেষ্টা করবেন, সম্ভবত পেয়েও যাবেন এক বছরের মধ্যে। যাই হোক, এখন সব কিছুই নির্ভর করছে রাণুদির বাবার ওপরে।

আমরা সবাই জানি, রাণুদির বাবাকে লম্বা টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছে। ওঁকে অনুরোধ করা হয়েছে খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবার জন্য।

সাড়ে ন'টার মধ্যেই আমাদের খাওয়া হয়ে গেল। এখানে এসে এত তাড়াতাড়ি আর একদিনও খাইনি। এরপর উৎপল কিছুক্ষণ তাস খেলার প্রস্তাব দিল, সে বিষয়ে খানিকটা মতভেদ দেখা দিল আমাদের মধ্যে। আমরা ছাদে গিয়ে দাঁড়ালাম। সারাদিন বেশ গরম ছিল, এখন চমৎকার ঠাণ্ডা হাওয়া। এই এক অদ্ভুত আবহাওয়া এখানে, দিনের বেলা যতই উত্তাপ থাকুক, শেষ রাত্তিরের দিকে গায়ে চাদর দিতে হয়।

দূরে কার যেন চ্যাচামেচি শুনতে পেলাম। আমরা উৎকর্ণ হয়ে একটুক্ষণ শুনেই বুঝতে পারলাম, রাণুদিদির বাড়ি থেকে সঞ্জয় বা অভিজিৎ কেউ ভাস্করদা, নীলুদা বলে ডাকছে।

এক মুহূর্ত দেরি না করে আমরা যে অবস্থায় ছিলাম সেইভাবেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছুটতে লাগলাম। এমনকি একটা চর্টও আনিনি, মাঠ ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। নিশ্চয়ই ও বাড়িতে খুব একটা কিছু বিপদ হয়েছে।

গেট দিয়ে যাবার ধৈর্য নেই, পাঁচিল ডিঙিয়ে গাছপালার মধ্য দিয়ে ছুটলাম।

সঞ্জয় তখনো ডেকে চলেছে। কাছেই বড়মামা দাঁড়িয়ে, তাঁর হাসি মুখ।

বড়মামার মুখ দেখেই আমাদের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল। বড়মামা আমাদের দেখে বললে, দেখেছো ছেলেটার কাণ্ড! এত করে বললাম, কালকে খবর দিলেই হবে, তা শুনলো না।

সঞ্জয় খুব উত্তেজিতভাবে বললো, দিদি ভালো হয়ে গেছে।

এই খবর দেবার জন্য সঞ্জয় আমাদের ডেকে এনেছে বলে আমরা তক্ষুনি ওর প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করলাম।

বড়মামা ঠাট্টা করে বললেন, এদিকে সাহস নেই, অন্ধকারের মধ্যে তোমাদের বাড়ি গিয়ে খবর দিতে ভয় পায়, তাই এখান থেকে চ্যাচাচ্ছে।

ভাস্কর জিজ্ঞেস করলো, রাণুদি কোথায়?

বড়মামা বললেন, চলো, দেখা করে আসবে। সত্যি অজিত ছেলেটা বোধহয় মন্ত্র-টন্ত্র জানে। আর যাই হোক, ছেলেটির মনের জোর আছে সাঙ্ঘাতিক। একথা স্বীকার করতেই হবে। মেডিক্যাল সায়েন্স যেখানে হার মেনে যায়, সেখানেও মানুষ মনের জোরে জিততে পারে।

রাণুদি আর অজিতদা এক সঙ্গে খেতে বসেছেন। মাসিমা এমনভাবে পরিবেশন করছেন, যেন ঠিক মেয়ে জামাইকে খাওয়াচ্ছেন। পরে শুনেছিলাম, রাণুদি স্বাভাবিকভাবে কথা বলার পর মাসিমা অজিতদার হাত ধরে কেঁদে ফেলেছিলেন, আনন্দের কান্না।

অজিতদাকে তিনি বলেছিলেন, বাবা, তুমি সত্যিই অসাধ্য সাধন করতে পারো। নিজের চোখে না দেখেলে বিশ্বাস করতাম না।

রাণুদি আমাদের দেখে হাসি মুখে জিজ্ঞেস করলেন, কি হে, ফোর মাস্কেটিটয়ার্স, আজ সারাদিন তোমাদের দেখা নেই কেন?

অজিতদা আমাদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলেন।

আমি মনে মনে প্রথমে রাণুদি তারপর অজিতদা, তারপর যত রাজের ঠাকুর দেবতা, সব ক'জন ভগবান এবং গোটা পৃথিবী এবং স্বর্গকে ধন্যবাদ দিলাম। রাণুদির ভালো হবার জন্য যারা সামান্যমাত্রও দায়ী, তারা সকলেই আমাকে ক্রীতদাস করে রাখতে পারে।

ভাস্কর বললো, আমাদের ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে কাল খেলা আছে কিন্তু! সক্কালবেলা যেতে হবে!

রাণুদি বললেন, আমি ঠিক যাবো। আমিই তোমাদের ডেকে তুলবো দেখো। তোমরা এখানে খেয়ে যাও।

—আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে।

—ওমা, এর মধ্যে খাওয়া হয়ে গেল? যাঃ! একটা করে মাছ ভাজা খাও অন্তত, অনেক মাছ ভাজা আছে। মা, ওদের দাও না!

রাণুদি কিছুতেই শুনলেন না। সেই ভরা পেটেই আমাদের আবার মাছ ভাজা খেতে হলো।

আমরা গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরে এলাম। আবার আমাদের জীবনটা চমৎকার হয়ে গেল। শুধু একটু মন খারাপ লাগতে লাগলো আমাদের। বাড়ি থেকে আর একটা কড়া চিঠি এলেই আমায় ফিরে যেতে হবে। বাবা এখন কেমন আছেন কে জানে। রাণুদি আর অজিতদার বিয়েটা বোধহয় আমার দেখা হবে না।

এর পরের দুটো দিন আমাদের খুব আনন্দে কাটলো। শুধু আমরা নয়, রাণুদির মা-ও এখন বুঝে গেছেন যে অজিতদার সঙ্গে বিয়ে হলেই রাণুদি বেঁচে যাবেন। অজিতদা যতক্ষণ সঙ্গে থাকেন, ততক্ষণ রাণুদি একেবারে স্বাভাবিক। রাণুদি শুধু দেখতে সুন্দর নন, এমনিতে ওঁর মনটা খুব নরম আর দয়ালু, অন্য কারুর কষ্ট উনি কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না।

একবার হোঁচট খেয়ে আমার পা কেটে গেল আর তার জন্যই কী দারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন রাণুদি। এমন করতে লাগলেন, যেন কেঁদেই ফেলবেন। আমার বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের নোখের খানিকটা অংশ উড়ে গিয়ে রক্ত পড়ছিল বেশ, আমার খুবই ব্যথা লেগেছিল, কিন্তু অন্যদের সামনে তো আর তা প্রকাশ করা যায় না, সেইজন্য কিছুই হয়নি, কিছুই হয়নি বলছিলাম। রাণুদি আমাকে জোর করে এনে বসালেন আমাদের বাড়ির বারান্দায়। রান্দাঘর থেকে গরম জল আনিয়ে আমার ক্ষতস্থানটা পরিষ্কার করে দিলেন। ততক্ষণে রাণুদির হুকুমে সঞ্জয় দৌড়ে বাড়ি থেকে ডেটল, তুলো, মারকিওরোক্রোম আর ব্যাণ্ডেজ নিয়ে এসেছে। ওষুধ মাখিয়ে আমার পা-টা লাল করে দিতে দিতে রাণুদি বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, খুব লেগেছে, তাই না? ইস, খুবই লেগেছে!

.....এমন মানুষও পাগল হয়? এটা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অন্যায় নয়?

রাণুদি আমার পায়ে হাত দিচ্ছেন বলে আমার লজ্জাও করছিল আবার রাণুদির ছোঁয়ায় আমায় ব্যথাও যে কমে গিয়েছিল একেবারে। রাণুদি আমার এত কাছে, আমি রাণুদির চুল ও শরীরের গন্ধ পাচ্ছি, একেবারে রাণুদির নিজস্ব গন্ধ, ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে রাণুদির বুকের আভাস, ঠিক যেন সোনার.....। আমি মনে মনে আবার অজিতদা হয়ে গিয়ে রাণুদিকে খুব আদর করতে লাগলাম। আমার অদৃশ্য দুটি হাত খেলা করতে লাগলে রাণুদির শরীরে।

আমি মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলাম, যেন এই পায়ের ব্যথাটার জন্য আমার খুব জ্বর হয়, তাহলে আমি সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকবো, রাণুদি আসবেন আমার কাছে, আমার শিয়রের কাছে বসবেন, আমার গায়ে হাত দেবেন, তখন আমিও রাণুদিকে—

কত লোকই তো বাইরে বেড়াতে যায়, সাধারণভাবে কয়েকদিন আনন্দ ফূর্তি করে, আবার ফিরে আসে। কোনো অন্যরকম ঘটনা ঘটে না। কিন্তু সেবার মধুপরে ঐ কয়েকটা দিনেই কত কী যে ঘটেছিল! অবশ্য, আমি যতবারই বাইরে কোথাও বেড়াতে গেছি, প্রত্যেকবারই অনেক নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে। সামান্য ছোটখাটো টুকিটাকি ব্যাপারও কত মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে। তবে, জীবনে সেই প্রথমবার গুরুজনদের সঙ্গে ছাড়া স্বাধীনভাবে বেড়াতে যাওয়ার কোনো তুলনাই হয় না অন্য অভিজ্ঞতার সঙ্গে।

এরপর, আমাদের মধুপুর-প্রবাসের দিনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সাঙ্ঘাতিক ঘটনাটি ঘটলো।

আমাদের ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট খেলাটা বেশ জমে উঠেছিল। বড়মামা একটা কাপও ডিক্লেয়ার করে দিয়েছেন। সিঙ্গল্‌স-এর খেলায় উৎপল, রাণুদি, ঝুমা আর ভাস্কর জমিয়ে দিয়েছে খুব, আমিও এই খেলাটা তেমন খারাপ খেলি না। নেহাত পায়ে এই চোটটা লাগবার পর খোঁড়াতে হচ্ছে, ভালো দৌড়তে পারছি না, এই যা! ডাবলস্‌-এর খেলায় রাণুদির পার্টনার অজিতদা, কিন্তু অজিতদার আর যত গুণই থাক, ব্যাডমিন্টনটা খেলতে পারে না মোটেই, সুতরাং রাণুদি আর একলা কত সামলাবেন। আমি আর উৎপল রাণুদিদের টিমকে যা-তা ভাবে হারিয়ে দিলাম। যদিও তাতে আমার খুব একটা আনন্দ হলো না, রাণুদিকে হারিয়ে আমার মায়া হতে লাগলো। রাণুদির মন ভালো রাখবার জন্য ওঁকে সব ব্যাপারেই জিতিয়ে দেওয়া উচিত, কিন্তু খেলতে নেমে আর সে-কথা মনে থাকে না।

রাণুদি অবশ্য খুব একটা ভেঙে পড়লেন না। অজিতদাকে বললেন, আমরা এবার কয়েকদিন প্র্যাকটিস করে নিয়ে, দেখো, পরের বছর ওদের সবাইকে হারিয়ে দেবো।

অজিতদা হাসতে হাসতে বললেন, ঠিক আছে, পরের বছরও আমরা সবাই মধুপুরে আসবো। কী, কথা রইলো তো?

ভাস্কর বললো, নিশ্চয়ই।

বৃহস্পতিবার দিন বিকেলে দারুণ হাওয়া উঠে আমাদের খেলাটা ভেস্তে গেল। অবশ্য, এই কদিনও আমরা খেলেছি জোর করেই। শীতকাল ছাড়া ব্যাডমিন্টন খেলা জমে না। হাওয়াতে সার্ভিস ঠিক থাকে না, মারলাম একদিকে, কর্ক চলে গেল অন্য দিকে।

সেদিন খেলা বন্ধ করে নেট গুটিয়ে আমরা মাঠের ওপরেই বসলাম গোল হয়ে। পরী সেখানেই আমাদের চা দিয়ে গেল। মধুপুরে এসে আমরা দুবেলা চা খাওয়ায় খুব রপ্ত হয়ে উঠেছি। কলকাতায় মাঝে মাঝে সকালে শুধু এক কাপ চা খেতাম। এখানে এসে আমরা যেন পুরোপুরি বয়স্ক হয়ে উঠেছি।

আস্তে আস্তে সন্ধে নেমে এসেছে, আমরা অজিতদার কাছে দিল্লির গল্প শুনেছি। দিল্লি সম্পর্কে রাণুদির আগ্রহই বেশী। অন্য মেয়েরা নিজের বিয়ের প্রসঙ্গ তুলতে লজ্জা পায়, কিন্তু রাণুদি তো সাধারণ মেয়েদের মতন নন।

রাণুদি এক সময় বললেন, আমি জানি, দিল্লিতে গেলে আর আমার কোনোদিন অসুখ করবে না। আমি একদম ভালো হয়ে যাবো।

অজিতদা বললেন, তুমি তো ভালোই হয়ে গেছ, রানু।

রাণুদি বললেন, দিল্লি থেকে তুমি আমাকে একবার হিমালয় পাহাড় দেখাতে নিয়ে যাবে? আমার খুব পাহাড় দেখতে ইচ্ছে করে।

অজিতদা বললেন, নিশ্চয়ই।

সেই সময় একটা গাড়ির শব্দ হলো।

এই রাস্তায় গাড়ি প্রায় আসেই না, তাই আমরা সবাই কথা বন্ধ করে সেদিকে তাকালাম। তাহলে বোধহয় কাছাকাছি কোনো বাড়ির লোক এলো।

আমাদেরই বাড়ির গেট ঠেলে ঢুকলো কয়েকজন পুলিশ।

আমরা অবাক। হঠাৎ পুলিশ এখানে? সেই যে রাণুদি, একদিন হারিয়ে যাবার পর বড়মামা পুলিশের খবর দিয়েছিলেন, তারপর আর পুলিশ সে ব্যাপারে কোনো খোঁজও নেয়নি একবারও। এতদিনে বুঝি সেই কথা মনে পড়েছে। পুলিশের ব্যাপারই আলাদা।

পুলিশকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই অজিতদা বিদ্যুতের মতন উঠে দাঁড়িয়ে ছুটলেন বাগানের দিকে।

একজন পুলিশ অফিসার চিৎকার করে বললেন, হল্ট! অর আই উইল ফায়ার।

অজিতদা না থেমে পৌঁছে গেলেন পাঁচিলের কাছে। সেখানে একবার ফিরে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে বার করলেন একটা কী যেন। আবছা অন্ধকারে ভালো দেখা যাচ্ছে না অজিতদাকে।

পরের মুহূর্তেই গুলির শব্দ হলো।

আমরা বিমূঢ় হয়ে বসেছিলাম। ভাস্কর চেঁচিয়ে উঠলো, শুয়ে পড়, সবাই শুয়ে পড়।

হাত ধরে জোর করে টেনে সে রাণুদিকেও শুইয়ে দিল।

আমার বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করে শব্দ হচ্ছে। স্কুল থেকে একবার স্ট্রাইক করে মিছিল নিয়ে আমরা গিয়েছিলাম ওয়েলিংটন স্কোয়ারে, তখন পুলিশ গুলি চালিয়েছিল। খুব কাছ থেকে সেই প্রথম আমি গুলির শব্দ শুনি, আর এই এবার দ্বিতীয়বার।

কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো, এবার গুলি চালিয়েছে অজিতদা। তার মানে অজিতদার কাছে সব সময় একটা রিভলভার থাকে।

রোমাঞ্চে আমার সারা শরীর কাঁপতে লাগলো। বিপ্লবী! অজিতদা নিশ্চয়ই একজন বিপ্লবী! গোড়া থেকেই অজিতদার ব্যবহারে একটু অন্যরকম কিছু ছিল। একজন সত্যিকারে বিপ্লবী আমাদের সঙ্গে এত সহজভাবে মিশেছেন।

অজিতদার জন্য রাণুদির নিশ্চয়ই এখন আরও বেশী গর্ব হবে। আমি মনে মনে বলতে লাগলাম, হে ভগবান, অজিতদা যেন ধরা না পড়েন। কিছুতেই না।

অনেকগুলো পুলিশ আমাদের বাগানের ফুলগাছ মাড়িয়ে দৌড়োদৌড়ি করছে আর চ্যাঁচাচ্ছে। কয়েকজন ধপাস ধপাস করে পার হয়ে গেল পাঁচিল। আরও দু'বার গুলির শব্দ হলো। নিশ্চয়ই কারুর গায়ে লাগেনি, কারণ কেউ তো ব্যথায় চেঁচিয়ে ওঠেনি।

আমি মনে মনে ভগবানকে ডেকেই যাচ্ছি। তখনো যে অজিতদা ধরা পড়েন নি, তা বোঝা যায়। এই অন্ধকারের মধ্যে অজিতদা বহুদূর চলে যেতে পারবেন।

তখন রাণুদির কান্নার শব্দ পেলাম।

মাটিতে মুখ চেপে রাণুদি বলছেন, বাঁচবে না, আমি জানি, ও বাঁচবে না!

॥১০॥

মাঝ পথে পুজো থামিয়ে বড়মামা সতীশবাবুকে টর্চ নিয়ে হাতে চলে এলেন এ বাড়িতে। গুলির শব্দ তিনিও শুনতে পেয়েছেন।

পুলিশরা কেউ আর নেই বাগানে। আমরাও সবাই মাঠ ছেড়ে চলে এসেছি বারান্দায়। বড়মামাকে দেখে আমরা প্রথমে সবাই মিলে এক সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলাম, তাতে উনি কিছুই বুঝতে পারলেন না।

তারপর ভাস্কর নেতৃত্ব নিয়ে সবাইকে থামিয়ে ঘটনাটা জানালো।

বড়মামা ভুরু কুঁচকে বললেন, পুলিশ? আমি অন্যরকম ভেবেছিলাম। এ বাড়িতে একটা বন্দুক আছে আমি জানি। ভাবলাম, তোমরাই কেউ ছেলেমানুষী করে সেটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে—

কথা থামিয়ে বড়মামা রাণুদির দিকে তাকালেন। রাণুদির ব্যবহারে খুব অস্বাভাবিক কিছু এখনো প্রকাশ পায়নি।

রাণুদির মুখখানা বিবর্ণ, তিনি শুধু জিজ্ঞেস করলেন, পুলিশরা ওকে মেরে ফেলবে, তাই না? ওকে মারবার জন্য এসেছে!

বড়মামা বললেন, কী ব্যাপার, কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

পুলিশের গাড়িটা তখনো দাঁড়িয়ে আছে গেটের কাছে। ভাস্করকে নিয়ে বড়মামা এগিয়ে গেলেন সেই গাড়িটার কাছে। যাবার সময় বললেন, রাণু, তুমি ব্যস্ত হয়ো না। একটু চুপ করে বসে থাকো, আমি সব খবর জেনে আসছি।

কোথা থেকে কিছু লোক এসে এর মধ্যেই গাড়িটার পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। আমারও খুব ইচ্ছে করছিল ওখানে যাবার, কিন্তু সবাই মিলে চাঞ্চল্য দেখানো রাণুদির সামনে উচিত হবে না।

আমি রাণুদিকে জিজ্ঞেস করলাম, অজিতদা আপনাকে একবারও বলেন নি যে উনি বিপ্লবী?

রাণুদি দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, না।

এত বড় একটা ব্যাপারে আমরা দারুণ বিচলিত হয়ে পড়লেও সেই তুলনায় রাণুদি যেন অনেক শান্ত। কোন ঘটনার প্রতিক্রিয়া যে কীভাবে ওর মনের মধ্যে দেখা দেবে, তার কোনো ঠিক নেই।

ভাস্কর আর বড়মামা একটু বাদেই ফিরে এলেন। বিশেষ কিছু খবর পাওয়া যায় নি। গাড়িতে রয়েছে শুধু ড্রাইভার আর একজন রোগা মতন পায়জামা শার্ট-পরা লোক। তারা বিশেষ কিছু বলতে পারেনি কিংবা বলতে চায়নি। শুধু বলছে, ডাকু পাকড়ানে আয়া!

ভাস্কর বললো, ঐ রোগা পায়জামা শার্ট পরা লোকটাকে চেনা চেনা মনে হলো। খুব সম্ভবত ও দু-একদিন ডিম বিক্রি করতে এসেছিল।

উৎপল বললো, এ ব্যাটাই স্পাই!

বড়মামা বললেন, তোমরা এখানে বসে কী করবে। চলো, সবাই আমাদের ওখানে চলো। দিদিকেও খবরটা দিতে হবে।

আশু বললো, আমরা দু-একজন এখানে থাকি। গাড়ি যখন রয়েছে, পুলিশরা তো এখানে ফিরে আসবেই, তখন খবরটা পাওয়া যাবে।

বড়মামা বললেন, ড্রাইভারকে বলেছি, ইন্সপেক্টর এলে আমাকে একবার খবর দিতে। আমি এখানকার পুরোনো লোক, পুলিশের লোকেরা সবাই চেনে। আয় রাণু।

রাণুদি বললেন, ওরা যদি ওকে মেরে ফেলে, তারপর আমাদের দেখতে দেবে?

বড়মামা বললেন, মেরে ফেলবে মানে? মারা অত সহজ নাকি?

আমার ইচ্ছে করলো, মাঠের মধ্যে যেদিকে পুলিশরা অজিতদাকে তাড়া করে গেছে, সেই দিকটায় গিয়ে একবার দেখে আসি। চুপি চুপি দূর থেকে দেখবো—

সে কথা উচ্চারণ করা মাত্রই সবাই ধমকে দিল আমাকে। গুলি গোলা চালিয়েছে, তার মধ্যে যাওয়া মানে বিপদকে আরও ডেকে আনা।

রাণুদি আপত্তি করলেন না, বড়মামার পাশে পাশে হাঁটতে লাগলেন। বাগানে আমার চায়ের কাপ ডিসগুলো এখনো পড়ে আছে। মাত্র পনেরো কুড়ি মিনিট আগেও আমরা এখানে কী সুন্দর গল্প করছিলাম, এরমধ্যে কত কী হয়ে গেলো। ওরা অজিতদাকে ধরতে পারবে?

ও বাড়ির চাতালে গিয়ে আমরা কলকোলাহল করে এই ঘটনাই আলোচনা করতে লাগলাম। বড়মামা এর মধ্যে অসমাপ্তপুজো সেরে নিলেন।

আশ্চর্য ব্যাপার, অজিতদাকে পুলিশ তাড়া করেছে শুনে মাসিমা ধপ করে বসে পড়ে অজ্ঞানের মতন হয়ে গেলেন, চোখ দুটো কী রকম যেন হয়ে গেল। আর তখন রাণুদিই সেবা করতে লাগলেন মা-কে। মা তোমার কী হলো, কী হলো? বলে তিনি তাড়াতাড়ি কুয়োর কাছ থেকে এক মগ জল এনে মায়ের চোখ মুখে ছিটোতে লাগলেন।

পুলিশ ফিরে এলো প্রায় এক ঘণ্টা বাদে।

কনস্টেবলরা বসে রইলো গাড়িতে, ইন্টপেক্টরের মতন পোশাক পরা তিনজন পুলিশ গেট খুলে ভেতরে এলো জুতো মশমশিয়ে। কালীমন্দির দেখে তারা ভক্তিভরে প্রণাম করলো প্রথমেই।

আমাদের মধ্যে বড়মামাই শুধু কথা বলবেন। পুলিশদের দিকে সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বড়মামা জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপারটা হলো বলুন তো! কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

একজন পুলিশ অফিসার বিশ্রী একটা গালাগালি দিয়ে বললো, ব্যাটা এবারেও ভেগে পড়লো। নটোরিয়াস ক্রিমিন্যাল মোশাই, আপা নাদের ভি সর্বনাশ করে দিত।

রাগে গা জ্বলে গেল আমার। এরা অজিতদাকে গালাগাল দিচ্ছে। এরা বিপ্লবীদেরও ক্রিমিন্যাল বলে।

বড়মামা চাতালটা দেখিয়ে দিয়ে পুলিশ তিনজকে বললেন, বসুন না। বৈঠিয়ে আপলোগ। সিংজী, সব ব্যাপারটা খুলে বলুন তো!

পুলিশ তিনজন বসে পড়লো চাতালে। একজন জিজ্ঞেস করলো, জুতা খুলনে হোগা?

বড়মামা বললেন, না, ঠিক আছে।

সিংজী যার নাম সেই পুলিশটি পকেট থেকে একটা ছবি বার করে বললো, ইয়ে দেখুন, শিবনাথ পাণ্ডে। ডাকু আউর খুনী। পাটনায় তিন তিনটে কেস ঝুলছে। এরকম ডেঞ্জারাস আদমি আপনার বাড়িতে ঘুষেছিল।

আমরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে ছবিটা দেখলাম। অজিতদারই যে ছবি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মুখে দাড়ি নেই শুধু তবু চিনতে অসুবিধে হয় না।

কিন্তু অজিতদার আসল নাম শিবনাথ পাণ্ডে? অজিতদা একটা ছদ্মনাম নিলেও উনি বিহারী হয়ে বাঙালী সাজবেন কী করে। ওঁর বাংলায় তো কোন খুঁত নেই। নিশ্চয়ই কোনো ভুল হয়েছে। পুলিশ একজনের দোষ অন্যের নামে চাপায়।

বড়মামাও অজিতদাকে বাঙালী বলয় সিংজী বললো, হ্যাঁ, হাঁ, ওর মা বাঙালী, বা বিহারী। লেকিন, বাঙালীদের সঙ্গেই ওর বেশী কারবার। আউর ভি দেখুন।

সিংজী আরও তিন-চারখানা ছবি বার করে দেখালো। সব কটাই অজিতদার।

বড়মামা বিহ্বলভাবে বললেন, আপনাদের কোনো ভুল হয়নি তো?

সিংজী বললো, আরে নেহি, ডাক্তারবাবু! দু'জন পাটনা থেকে এসেছেন, ইনারা খুব ভালো করে চিনেন। একবার ধরাও পড়েছিল শালা।

বড়মামা বললেন, রাণু, তুমি ভেতরে যাও। খোকন, দিদিকে ভেতরে নিয়ে যা তো!

রাণুদির পাশেই ছিলাম আমি। রাণুদি ঠোঁটটা শুধু কামড়ে ধরেছিলেন, আর কোনোরকম অসুস্থতার চিহ্ন প্রকাশ পায় নি। তিনি শান্তভাবে বললেন, না, আমি এখানেই থাকবো। আপনারা কি ওকে মেরে ফেলেছেন?

সিংজী রাণুদির আপাদমস্তক দেখে দুঃখের সাথে মাথা নেড়ে বললেন, ইনাকেও আমার ইন্টারোগেট করতে হবে। তব্ আপনার নসীবসে বেঁচে গেছেন। ও বহুৎ ডেঞ্জারাস ক্রিমিন্যাল। নিজের শালার উ, ওয়াইফের ভাইয়ের যে ইস্তিরি, তাকে ও পহেলা খুন করে।

সেখানে একটা বোমা পড়লেও আমার এতটা বিস্মিত হতাম না। আমি তার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত অজিতদাকে বিপ্লবী বলেই ভাবছিলাম। কিন্তু অজিতদা বিবাহিত? একজন মহিলাকে তিনি খুন করেছেন? কোনো খুনী অন্যদের সঙ্গে এমন ভালো ব্যবহার করতে পারে?

আমার মুখ থেকে আপনিই বেরিয়ে এলো, মিথ্যে কথা!

একজন পুলিশ আমার দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এ ছোক্‌রা কে আছে?

বড়মামা ব্যস্ত হয়ে বললেন, ওরা পাশের বাড়িতে থাকে, ওরা কিছু জানে না। এই তোমরা এখন সব ভেতরে যাও!

এতেও কিন্তু রাণুদির মধ্যে কোন ভীষণ কিছু ব্যাপার ঘটলো না। তিনি ধীর পায়ে চলে গেলেন বাড়ির দিকে। আমরা দুরু দুরু বুকে সেদিকে চেয়ে রইলাম। রাণুদি গতি বাড়ালেন না একটুও, যেন কিছুই হয়নি, এইভাবে ঢুকে গেলেন নিজের ঘরে।

পুরো ঘটনাটা আমরা এর পরে শুনলাম। অজিতদা ওপরফে শিবনাথ পাণ্ডে মোটামুটি লেখাপড়া শিখে পাটনায় একটা চাকরি করতেন। বিয়ে টিয়ে করে সংসারীও হয়েছিলেন সাধারণ লোকের মতন। তারপর নিজের শ্যালকের স্ত্রীর সঙ্গে একটা অবৈধ ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে শেষ পর্যন্ত তাকে খুন করে ফেলেন রাগের মাথায়। সেই থেকে ফেরার বছর দেড়েক ধরে ফেরার থাকার সময় খরচ চালাবার জন্য গোটা দুয়েক ডাকাতি করেছেন, তার মধ্যে মজঃফরপুরে এক ব্যাঙ্ক ডাকাতির সময় একজন ক্যাশিয়ার খুন হয়, সে খুনের ব্যাপারেও অজিতদাই দায়ী বলে পুলিশ সন্দেহ করে।

মধুপুরের বাড়িটা মোটেই ওর জামাইবাবুর নয়। মালির কাছ থেকে অজিতদা ওটা ভাড়া নিয়েছেন। এখানকার অনেক ফাঁকা বাড়িই মালিরা গোপনে ভাড়া দেয়। এইসব জায়গায় লুকিয়ে থাকার খুব সুবিধে। একবার কলকাতায় পুলিশ ওকে প্রায় ধরে ফেলেছিল, একটুর জন্যে ফস্কে যায়। মধুপুরে প্রায় চার মাস ধরে ও লুকিয়ে আছে, ওর

কিছু সাকরেদও নিশ্চয়ই আছে আশেপাশে। এখান থেকেই কাছাকাছি কোনো জায়গায় আবার ডাকাতির ফন্দি আঁটছিল, পুলিশের এরকম সন্দেহ।

সেইদিনই প্রথম আমরা চারজনে একসঙ্গে এক ঘরে শুতেও ভয় পেলাম। যদি অজিতদা হঠাৎ ফিরে আসে? অজিতদার মুখখানা মনে পড়লেই এখন ভয় করছে।

আর কেউ আপত্তি করতে পারলুম না। বন্দুক নিয়ে আসা হলো সেই বন্ধ ঘর থেকে। তবু যেন একটা বন্দুক দেখলে একটু সাহস জাগে।

উৎপল বললো, অজিতদা কোথায় লুকুতে পারে, সেটা বোধহয় একমাত্র আমরাই জানি।

ভাস্কর বললো, হ্যাঁ, সেই আসল সাধু নয়। ডাকাতের মতন চেহারা। আমি তখনই সন্দেহ করেছিলুম।

আশু বললো, সে কথা আগে বলিস নি কেন?

উৎপল বললো, বলিনি, মানে বলে কী হবে, এই ভেবেছিলুম। আমি অজিতদাকে তো সন্দেহ করিনি। তোদেরও লক্ষ্য করা উচিত ছিল, সাধুটা ভাত রাঁধছিল। বিহারী সাধুরা ভাত খায়?

ভাস্কর বললো, ওর মুখের হিন্দীটাও যেন কেমন কেমন! ঐ লোকটাও নিশ্চয়ই বাঙালী।

আশু বললো, আমার একবার মনে হয়েছিল, পুলিশের কাছে ঐ সাধুটার কথা বলবো কি না!

ভাস্কর বললো, আমাদের কী দরকার? অজিতদা তো আমাদের কোনো ক্ষতি করেনি! আমরা ওকে ধরিয়ে দিতে যাবো কেন?

আশু বললো, তবুও এটা আমাদের ডিউটি পুলিশকে সাহায্য করা। তাছাড়া রাণুদিকে নিয়ে অজিতদা কী করতে চেয়েছিল কে জানে? বোধহয় গয়নাগাঁটি সমেত রাণুদিকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে পরে খুন করে ফেলতো!

ভাস্কর বললো, কী দারুণ লোক মাইরি! একদম বুঝতে পারিনি।

আশু বললো, তোরা কি বলিস? কাল সকালে পুলিশের কাছে ঐ পাহাড়ের কথাটা আমাদের জানিয়ে আসা উচিত নয়?

উৎপল বললো, চুপ! কার যেন পায়ের শব্দ শুনলাম!

আমরা কান পেতে রইলাম। আর কোনো শব্দ শোনা গেল না। আশু আর ভাস্কর সাহস করে একবার বাইরেটা উঁকি দিয়ে দেখে এসে বললো, ধুৎ কোথায় পায়ের শব্দ। কেউ তো নেই!

উৎপল বললো, আমার বার বার মনে হচ্ছে, অজিতদা যেন ফিরে এসে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের সব কথা শুনছে।

ভাস্কর বললো, অত ভয় পাবার কিছু নেই। ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ, সব আজ বন্ধ থাকবে। তোরা ঘুমিয়ে পড়লেও আমি একলা আজ রাতটা জেগেই কাটিয়ে দেব।

উৎপল বললো, পুলিশ ফুলিসে আমাদের খবর দেবার কোনো দরকার নেই। তারপরও যদি অজিতদা ধরা না পড়ে আর আমাদের ওপর রিভেঞ্জ নেয়?

ভাস্কর বললো, অত সোজা নয়। তাছাড়া আমরা তো চলেই যাবো এখান থেকে। আর থাকতে ভালো লাগছে না।

আশু বললো, রাণুদির কী হবে?

উৎপল বললো, আজ কিন্তু খুব চমৎকার সামলে নিয়েছে।

ভাস্কর বললো, আর একটা কথা ভেবে দেখেছিস? মনে কর, কাল কোনো এক সময় অজিতদা যদি চুপিচুপি ফিরে এসে রাণুদিকে নিয়ে যেতে চায়? রাণুদি যদি রাজি হয়ে যায়? রাণুদিকে এমনভাবে জাদু করেছে যে রাণুদি বোধহয় এখনো রাজি হবে।

উৎপল বললো, লোকটার মেয়ে পটাবার ক্ষমতা আছে। একটা পাগল মেয়েকে পর্যন্ত.....

ভাস্কর বললো, রাণুদিকে নিতে চাইলে কী হবে বল না?

আশু বললো, আমরা আটকবো। আমরা চার জনে মিলে ওকে বেঁধে ফেলতে পারবো না?

উৎপল বললো, ওর কাছে রিভলবার আছে।

ভাস্কর বললো, আমাদেরও বন্দুক আছে। তোরা বিশ্বাস করছিস না, কিন্তু আমি সত্যিই বন্দুক চালাতে পারি। অন্তত ভয় দেখাতে তো পারবো।

আশু বললো, নীলুটা ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি রে?

উৎপল বললো, কী জানি, সাড়া শব্দ তো পাচ্ছি না। উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে।

ভাস্কর বললো, সেই যেদিন সারাদিন ছিল না অজিতদা, সন্ধের পর জসিডি থেকে ফিরলো, সেদিন আমি লক্ষ্য করেছিলাম, ওর প্যান্টে চোরকাঁটা লেগে আছে। জসিডিতে গেলে প্যান্টে চোরকাঁটা ফুটবে কোথা থেকে! সেদিনও মিথ্যে কথা বলেছিল, নিশ্চয়ই ঐ সাধুটার কাছেই গিয়েছিল মাঠ ভেঙে।

আশু বললো, কেন, ঐ টেলিগ্রামের ব্যাপারটা? মধুপুরের যন্ত্র খারাপ, সেইজন্য জসিডিতে যেতে হয়েছে, এটাও তো গুল। পরদিন রাণুদির বাবাকে টেলিগ্রামটা তো আমিই সঞ্জয়কে নিয়ে সাইকেলে গিয়ে পাঠিয়ে এলাম মধুপুর থেকে। ওরা বললো, কই না তো, আগের দিন তো যন্ত্র খারাপ ছিল না। আমি অবশ্য তখন ভেবে-ছিলাম, কোনো কারণে ওর জসিডি যাবার দরকার ছিল। রাণুদিকে ভোলাবার জন্য মিথ্যে কথা বলেছে।

ভাস্কর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, রাণুদির এবার কি হবে বল তো?

সে কথার কেউ উত্তর দিল না।

একটু পরে ওরা তিন জনেই আমার দিকে ফিরে ব্যস্ত হয়ে বললো, এই নীলু, তুই কাঁদছিস কেন?

আমি কিছুতেই কোনো কথা বলতে পারলাম না, অকূল কান্না যেন আমায় ভাসিয়ে দিতে চাইছে। রাণুদির ওপর এতখানি অন্যায় সহ্য করা আমার পক্ষে যেন অসম্ভব। অথচ, আমি কীই বা করতে পারি!

পৃথিবীতে অনেক ডাকাত-বদমাইশ আছে, আমি জানি। কিন্তু সত্যিকারের কিছু ভালো লোকও তো আছে। রাণুদির জন্য অজিতদা নামের লোকটি কি একটি খাঁটি ভালো লোক হতে পারতো না? যে মানুষটির জন্য রাণুদি নিজের মনটাকে ফিরে পাচ্ছিলেন, সেই মানুষটার আসলে কোনো হৃদয় নেই। এ অন্যায়, বিষম অন্যায়, অসহ্য অন্যায়!

ওরা কেউ আমাকে সান্ত্বনা দিতে পারলো না। চুপ করে রইলো।

ভেবেছিলাম, সকালবেলা উঠে দেখবো, আবার সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। অজিতদা চা খেতে এসেছেন আমাদের বাড়িতে, রাণুদি ব্যাডমিন্টন খেলছেন.....পুলিশ, রিভলবার, গুলি এ সবই একটা দুঃস্বপ্ন।

কিন্তু তা হলো না। পুলিশ অনবরত ঘোরাঘুরি করতে লাগলো, আমাদেরও জেরা করলো অনেকক্ষণ ধরে। অজিতদাকে ওরা এখনো ধরতে পারে নি, কিন্তু অজিতদা সম্পর্কে আরও খবর শুনতে লাগলাম নানা রকম।

পরের দু'দিন রাণুদি একটা অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে কাটালেন। ঠিক পাগলামি নয়, একটা যেন ঘোর লাগা ভাব। হাঁটছেন, কথা বলছেন, সবই ঠিক আছে, অথচ বোঝা যায় কিছুই ঠিক নেই। কখনো দাঁড়িয়ে থাকছেন একটা ফুল গাছের পাশে, কখনো কালী মূর্তির সামনে বসে গুনগুন করে গান গাইছেন আপন মনে।

একবার আমাদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কী, তোমরা আর ব্যাডমিন্টন খেলছো না?

আমরা সাগ্রহে বললাম, হ্যাঁ খেলবো। আপনি খেলবেন আমাদের সঙ্গে?

রাণুদি একটুক্ষণ যেন চিন্তা করে বললেন, না তোমরাই খেল, আমার ইচ্ছে করছে না।

রাণুদির কোনো কথাই অসংলগ্ন নয়। কিন্তু এক মিনিট দু'মিনিটের মধ্যে প্রসঙ্গ বদলে ফেলছেন।

আমরা অজিতদার নাম রাণুদির সামনে একবারও উচ্চারণ করিনি। উনি নিজেই অন্তত দুবার জিজ্ঞেস করলেন ও ধরা পড়েছে? ওকে ওরা মেরে ফেলেছে?

অজিতদার কথা রাণুদি ভুলে যাননি বলেই, ওঁর স্বাভাবিক চেতনা রয়েছে। অথচ এটাও স্বাভাবিক নয়। খুব গভীর দুঃখ বোধ বা আঘাত পাবার কোনো চিহ্ন নেই ওঁর ব্যবহারে।

আমি সর্বক্ষণ রাণুদির কাছাকাছি রইলাম এই দু'দিন। কিন্তু আমি তো অজিতদা নই। আমি রাণুদিকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলার মন্ত্র জানি না। রাণুদির চোখে আমি তো একটা বাচ্চা ছেলে, আমি আর ওঁর কতখানি সঙ্গী হবো?

রবিবার সকালে ঘুম থেকে উঠেই ভাস্কর বললো, আর ভালো লাগছে না, চল আজই ফিরে যাই।

কেউই আপত্তি করলো না। আমাদের এখানে স্বস্তি চলে গেছে। অজিতদার কোনো খবর নেই। পুলিশ মহল চুপচাপ। এদিকে সর্বক্ষণ রাণুদির কী হয়, কী হয় চিন্তা! রাণুদিকে দেখলে মনে হয়, যে কোনো মুহূর্তে কী হয়, উনি ভেঙে পড়বেন। এক এক সময় কথা বলতে বলতে রাণুদি দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে যান, মুখের রং রক্তবর্ণ হয়ে যায়, বোঝা যায় উনি প্রাণপণে নিজেকে সামলে নিতে চাইছেন। রাণুদি কিছুতেই হার স্বীকার করতে চান না।

ওরা যেতে না চাইলেও আমাকে আজ কালের মধ্যে একলা চলে যেতেই হতো। বাড়ি থেকে আবার চিঠি এসেছে। সুতরাং ভাস্করের প্রস্তাবে হতো। বাড়ি থেকে আবার চিঠি এসেছে। সুতরাং ভাস্করের প্রস্তাবে আমি কৃতজ্ঞ বোধ করলাম। জিনিসপত্র গোছগাছ করে নিলাম তখনই। ট্রেন অবশ্য রাত্রিবেলা।

চা-টা খেয়ে আমরা গেলাম রাণুদিদের বাড়ি বিদায় নিতে। প্রথমেই দেখা হলো বড়মামার সঙ্গে। তিনি আমাকে কথা শুনে খুব একটা আশ্চর্য হলেন না। গম্ভীরভাবে বললেন, কলেজ-টলেজ খুলে যাচ্ছে বুঝি? আজ রাণুর বাবা আসছে, তোমরা ও বেলা এসে একবার দেখা করে যেও অন্তত।

সঞ্জয় আর অভিজিৎ চেঁচামেচি করলো খানিকটা। তারপর ঠিকানা দেওয়া নেওয়া হলো। ঝুমা বললো, এবার বাবার সঙ্গে আমিও ফিরে যাবো। আমার আর একটুও পছন্দ হচ্ছে না এ জায়গাটা।

মুস্কিল হলো, রাণুদির কাছ থেকে কীভাবে বিদায় নেওয়া হবে? রাণুদি কথাটা কীভাবে গ্রহণ করবেন, তার তো ঠিক নেই। চার-জনের মধ্যে আমার সঙ্গেই রাণুদির একটু বেশী ভাব বলে, ওরা বললো, নীলু, তুই-ই খবরটা জানিয়ে দে রাণুদিকে।

আমি তাতে রাজি নই। যদি আমাদের কথা শুনলে রাণুদি অন্য রকম হয়ে যান? তার চেয়ে রাণুদিকে কিছু না বলে যাওয়া, বরং ভালো।

আমি ঠিক করলাম, রাণুদিকে একটা চিঠি লিখে সবাই মিলে সই করে সেটা রেখে যাবো ঝুমার কাছে। রাণুদি কাল যদি আমাদের খোঁজ করেন, তখন সেটা দেখানো হবে।

রাণুদির সঙ্গে দেখা হলো আমাদের। রাণুদি বাগানে ঘুরছেন চঞ্চলভাবে। সেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক জায়গায় চুপ করে কথা না বলে বসে থাকার অবস্থাটা এখন আর নেই। বরং ওঁকে যেন বেশ অস্থির বলে মনে হয়।

একবার আমাদের কাছে এসে হঠাৎ বললেন, তোমরা কিন্তু আমাকে সেই পাহাড়ের কাছে বেড়াতে নিয়ে গেলে না।

আমরা ঐ পাহাড়ের কথা শুনে চমকে উঠলাম। খুব সম্ভবত ওখানেই লুকিয়ে আছে অজিতদা। এখন ঐ পাহাড়ের কথা ভাবলেই ভয় করে।

-আজ যাবে? চলো না!

আমি আড়ষ্টভাবে বললাম, আজ!

রাণুদি বললেন, কেন, আজ তো বেশ ভালো দিন, বেশী রোদ্দুর নেই।

ভাস্কর বুদ্ধি করে বললো, ওখানে যাওয়া খুব মুস্কিল এখন। নদীর ওপর একটা সাঁকো ছিল, সেটা ভেঙে গেছে।

রাণুদি বললেন, কেউ কথা রাখে না।

পর মুহূর্তেই প্রসঙ্গ পাল্টে তিনি বললেন, কিছু কিছু ফুল দিনের বেলা ফোটে। আর কিছু ফুল ফোটে রাত্তিরবেলা, কেন এমন হয়?

তারপরই আবার বললেন, কিছু ফুল সূর্যকে ভালবাসে, কিছু ফুল চাঁদকে দেয়।

সঞ্জয় গেটের কাছ থেকে ছুটতে ছুটতে এসে আমাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বললো, নীলুদা, কয়েকটা লোক কী বলাবলি করতে করতে গেল জানো? ওরা বলছে, অজিতদার বাড়ির সামনে নাকি একটা পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে ভোর থেকে।

আমি বললাম, তোমার সাইকেলটা নিয়ে এসো তো!

আশু এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে রে?

আশু সাইকেলে একজনকে ক্যারি করেও খুব সহজে চালাতে পারে। সুতরাং ভাস্করের দিকে চোখের ইশারা করে আমরা দু'জনেই সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

একখানা নয়, দু'খানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে অজিতদার সেই বাড়ির সামনে। বহু আদিবাসী ভিড় করে আছে সেখানে। এইসব নিরালা জায়গায় পুলিশের গাড়িও একটা দর্শনীয় ব্যাপার।

বাইরে থেকেই আমরা দেখতে পেলাম হ্যাণ্ড-কাফ বাঁধা অজিতদা আর সেই সাধটিকে। পুলিশ ওদের কাঁধ খিমচে ধরে ঘোরাচ্ছে। বোঝা গেল পুলিশ সার্চ করছে পুরো বাড়িটা আর বাগান। অজিতদার চুলগুলো রুক্ষ, জামাটা ছেঁড়া, চোখ দুটো লালচে। চেহারাটা একেবারেই যেন বদলে গেছে।

আশু আর আমি চোখাচোখি করলাম। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর কোনো লাভ নেই, খবরটা এক্ষুনি অন্যদের জানানো দরকার।

বড়মামা তখন পুজোয় বসেছেন। আমরা ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করতে লাগলাম। এক মুহূর্তও দেরি করতে পারছি না যেন। খবরটা যদি কোনোক্রমে রাণুদির কানে যায়? তার আগেই কিছু একটা করা দরকার না!

মন্ত্র পড়া শেষ করে বড়মামা মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছেন। এই প্রণাম সারতেও অনেকক্ষণ লাগে। ভাস্কর চটি খুলে কাছে এগিয়ে গিয়ে বড়মামার কাছে ফিসফিস করে খবরটা জানালো।

বড়মামা মুখ তুলে ভাস্করের দিকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। দেখতে দেখতে তার দু'চোখ জলে ভরে গেল। তারপর চোখ মুছে ফিসফিস করে বললেন, নিয়তি! সবই নিয়তি!

ভাস্কর বললো, পুলিশ যদি ওকে নিয়ে এ বাড়িতে আসে?

বড়মামা বললেন, তা আসবে বোধহয়!

ভাস্কর বললো, রাণুদিকে এখন বাড়ির মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া যায় না?

বড়মামা বললেন, জোর করতে গেলে কোনো লাভ হবে কী? ও যদি নিজের ইচ্ছেতে যায়—

মাসিমা ব্যাপারটা শোনবার পর রাণুদিকে দু-একবার ডাকলেন। রাণুদি বাড়ির মধ্যে যাবেন না। তিনি এখন বাগানের প্রতিটি গাছের কাছে গিয়ে ফুলগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছেন।

কেউ কিছু ঠিকঠাক না করলেও আমরা সবাই এসে গেটের কাছাকাছি দাঁড়িয়েছি। পুলিশের গাড়িগুলো এখান দিয়েই যাবে। আমরা তখন রাণুদির দৃষ্টি থেকে গাড়িগুলোকে আড়াল করে রাখবো।

পুলিশের এমনই বুদ্ধি, গাড়ি দুটো ঠিক আমাদের গেটের কাছে এনেই দাঁড় করালো। সিংজী চেঁচিয়ে বললো, ও ডাক্তারবাবু, এবার শালে কো পাকড় লিয়া! কালী মাতা কি দয়া! একবার কালী মাইকে পরনাম করে যাই।

দারোগা গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামলো। আমাদের মুখে নীরব ব্যথা! এই খবরটা এত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে না বললে চলতো না? প্রথম গাড়িটার মধ্যে বসে আছে অজিতদা, হাতকড়া বাঁধা, দু পাশে দুজন পুলিশ। অজিতদা তাকিয়ে আছে আমাদের দিকেই, কিন্তু স্থির দৃষ্টি। আমাদের চিনতে পারার কোনো চিহ্ন নেই।

চট করে পেছন ফিরে দেখলাম, রাণুদি ধীর পায়ে এগিয়ে আসছেন এদিকে, যেন নিছক অলস কৌতূহলে।

একটা কিছু করা দরকার, এক্ষুনি একটা কিছু দরকার, আমরা সবাই ভাবলাম, কিন্তু কেউ কিছু করতে সাহস করলাম না। কেউ কি এখন জোর করে রাণুদিকে ফেরাতে পারে?

রাণুদি গেটের কাছে এসে সরলভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে এখানে?

তারপরই অজিতদার সঙ্গে রাণুদির চোখাচোখি হলো।

অজিতদা ঠিক আগেকার মতন গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছো, রাণু? এখন ভালো আছো?

রাণুদি বললেন, হ্যাঁ ভালো আছি। কেন ভালো থাকবো না?

ব্যাস শুধু এই দুটি কথা, আর কিছু না।

এরপরই রাণুদি পেছন ফিরে অহংকারের সঙ্গে চিবুকটা উঁচু করে রাণীর মতন ভঙ্গিতে আবার হেঁটে যেতে লাগলেন। গর্বে বুক ফুলে উঠলো আমার। রাণুদি অজিতদাকে মুখের মতন জবাব দিয়েছে। বদমাইশটা বুঝুক, ওকে বাদ দিয়েও রাণুদি ভালো থাকতে পারে।

রাণুদি বোধহয় এই মুহূর্তটার জন্যই ওঁর মনের শেষ জোরটুকু ধরে রেখেছিলেন। পুলিশের গাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাণুদি দৌড়তে লাগলেন, বাড়ির দিকেই। আমরাও সবাই ছুটে গেলাম রাণুদির পেছনে পেছনে।

প্রথমে মাসিমা আটকালেন রাণুদিকে। রাণুদি মায়ের হাত ধরে হাহাকার করে বললেন, মা, ও কে? ওকে জিজ্ঞেস করলো, আমি ভালো আছি কি না! ওকে তো আমি চিনি না!

তারপরই মাকে ছেড়ে রাণুদি চলে গেলেন কালী প্রতিমার সামনে। অসম্ভব জোরে চিৎকার করে বললেন, ও কে? মা, ও কে? আমি তো—

কথার মাঝখানে রাণুদি দড়াম করে আছড়ে পড়ে গেলেন কালী ঠাকুরের পায়ের কাছে। ও রকম সোজাসুজি কোনো স্বাভাবিক মানুষ পড়তে পারে না। রাণুদির কপাল ফেটে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এলো...।

তারপর কতবছর কেটে গেছে।

রাণুদির সঙ্গে তারপর আর কখনো দেখা হয়নি। ইচ্ছে করলে দেখা করতে পারতাম, করিনি। ভাস্করের সঙ্গে এর পরও ঝুমার বছর দু-এক যোগাযোগ ছিল চিঠিপত্রে। অভিজিৎ এখন একটা ব্যাঙ্কে কাজ করে, দেখা হয়েছে কয়েকবার। রাণুদির খবর ওর কাছেই শুনেছি, রাণুদিকে বছরে প্রায় ছ-মাস রাখতে হয় নার্সিং হোমে। বাকি ছ-মাস কিছুটা ভালো অবস্থায় বাড়িতেই থাকেন। পুরোপুরি স্বাভাবিক অবস্থা আর কখনো আসে না। বাড়িতে থাকতে থাকতে যখন আবার বাড়াবাড়ি শুরু হয়, জিনিসপত্র ভাঙতে শুরু করেন, সেই সময় আবার নার্সিং হোমে দিতেই হয়।

রাণুদির চেহারা নিশ্চয়ই এখন অনেক বদলে গেছে। দেখলে চিনতে পারবো কি-না সন্দেহ। না দেখাই ভালো। বাইরে যাদের সঙ্গে আলাপ হয়, কত অন্তরঙ্গতা হয়, পরে কলকাতায় এসে তাদের সঙ্গে সম্পর্কটা আবার ফিকে হয়ে যায় আস্তে। শুধু সতেরো বছরের সেই তীব্র বেদনাবোধ আমার এখনো যায়নি। আমার জীবনে আমি প্রথমে সত্যিকারের যে নারীকে ভালোবাসি, তিনি রাণুদি। যে ভালোবাসায় মানুষ একজনের জন্য জীবন দিয়ে দিতে পারে। আমার জীবন দিয়েও তো আমি রাণুদির কোনো উপকার করতে পারতাম না।

শুধু বেদনাবোধই নয়, আর একটি স্মৃতিও আমার মনে জ্বল-জ্বল হয়ে আছে। সেই যে একদিন দুপুরবেলা রাণুদিকে নিয়ে গিয়েছিলাম ছোট নদীটার ধারে। স্বর্গের দেবীর মতন রাণুদি বসেছিলেন পাথরটার ওপরে, অনেকগুলি কদম ফুল আমি এনে দিয়েছিলাম রাণুদির কোলের ওপর। আমার নিজস্ব নদী, আমার নিজস্ব কদম গাছ, আমার নিজস্ব রাণুদি। সেদিনই রাণুদির সামনে বসে, রাণুদির রূপের পূজারী হয়ে আমি কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে পৌঁছেছিলাম।

আমার সতেরো বছরের সেই বেদনা ও আনন্দে মেশা ছবিটি একটি সোনার ফ্রেমে বাঁধানো রয়েছে। আমি মরে গেলেও সেই ছবিটি থেকে যাবে।

- - -